



- মিস মনোয়ারা
- কাকারু
- পঙ্গু হামিদ
- ফোর্টি নাইন
- নগিরন বুয়া
- নয়া রিকশা
- আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ
- আলোড়া
- তিনি
- আলাউদ্দিনের ফাঁসি
- ভালোবাসা
- টিকটিকি
- ভূত

উৎসর্গ

বৃক্ষদের!
যাদের কারণে গল্পগুলি লেখা হয়েছে।

## ভূমিকা

*অন্যদিন* পত্রিকায় নিয়মিত ‘বৃক্ষকথা’ লিখতাম। একদিন হঠাৎ মনে হলো গাছের কথা কেউ পড়ে না। সবাই জানতে চায় মানুষের কথা। কাজেই প্রতিটি ‘বৃক্ষকথা’য় একটি করে গল্প লেখা শুরু করলাম। আরো একটি কারণ ছিল, অনেক দিন ছোটগল্প লিখি না। লিখতে ইচ্ছা করল।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী।



# সূচি



# মিস মনোয়ারা

আচ্ছা শোন, আমার না রোজ বিকেলে গা ম্যাজম্যাজ করে। কী করা যায় বলো তো?

ইমন হতাশ চোখে তাকাল। বিয়ের পর এই সমস্যা হয়েছে। শারমিন অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। সমস্যার সমাধান তার জানা নেই। শারমিনের সমস্যা নিয়ে হাজির হবার সময়টাও খারাপ। অফিসে যাবার আগে আগে। যখন ইমন শার্ট খুঁজে পাচ্ছে না, বেল্ট খুঁজে পাচ্ছে না। মোজা দু'টার একটা আছে, অন্যটা নেই।

এই, বলো না কী করি?

সমস্যাটা কি বিয়ের আগে ছিল না বিয়ের পর শুরু হয়েছে।

আগেও ছিল। এখন বেশি হচ্ছে। MMকে খবর দেব?

MMটা কে?

মিস মনোয়ারা। সংক্ষেপে MM.

উনি কী করবেন?

গা ম্যাসাজ করে দেবেন। বাসায় এসে একঘণ্টা ম্যাসাজ দেবেন। ঘণ্টায় পাঁচশ' টাকা।

গা টেপাটেপি করে পাঁচশ' টাকা?

শারমিন বিরক্ত গলায় বলল, এমন বিশ্রীভাবে কথা বলছ কেন? গা টেপাটেপি হবে কেন? MM প্রফেশনাল মহিলা। ব্যাংকক থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন।

ইমন বলল, গা টেপাটেপিতে PhD করা?

শারমিন বলল, তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ কেন? আশ্চর্য! পাঁচশ' টাকা তোমার কাছে বেশি মনে হচ্ছে? রোজ তো আমি ম্যাসাজ করাব না। সপ্তাহে একদিন। মাসে চারবার— দু'হাজার টাকা যাবে। সেই টাকাও তোমাকে দিতে হবে না। আমি দেব।

==============================================

ইমন চুপ করে গেল। বিয়ের সময় শারমিনের বাবা তাকে পাঁচ লাখ টাকা নগদ দিয়েছেন। টাকাটা FDR করা। প্রতি তিনমাস পর শারমিন ইন্টারেস্ট তোলে এবং মহানন্দে জিনিসপত্র কেনে। পাথরের কানের দুল, হাড়ের তৈরি সাবানদানি, টাওয়েল, স্যান্ডেল।

শারমিন বলল, কথা বলছ না কেন ? খবর দেব ? তোমার পকেট থেকে তো টাকা যাচ্ছে না।

ইমন বলল, পকেট থেকে টাকা যাওয়া-যাওয়ি না। জিনিসটা আমার পছন্দ না। নেংটা হয়ে পড়ে থাকবে, একজন ঘোড়ার মতো তোমাকে দলাই মলাই করবে।

শারমিন বলল, আমার সঙ্গে সাবধানে কথা বলবে। রিকশাওয়ালাদের মতো কথা বলবে না। আমার মেজখালা উনার কাছে প্রতি সপ্তাহে ম্যাসাজ নেন। মিস মনোয়ারা ম্যাসাজের আগে কার্বলিক সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেন। বুঝেছ ?

হুঁ। বুঝেছি। মিস মনোয়ারাকে আসতে বলো।

আমি ঠিক করেছি প্রতি বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ম্যাসাজ নেব। ম্যাসাজের পর গোসল করে লাঞ্চ করব, ঠিক আছে ?

আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ঠিক আছে কি-না! আমাকে নিশ্চয় অফিস বাদ দিয়ে সেই সময় উপস্থিত থাকতে হবে না ?

তুমি এখনো রেগে রেগে কথা বলছ। রাগ কমিয়ে স্বাভাবিকভাবে এক মিনিট আমার সঙ্গে কথা বলবে, তারপর অফিসে যাবে। তুমি মুখ ভোঁতা করে থাকলে আজ আমি তোমাকে অফিসেই যেতে দেব না।

ইমন হাসার মতো ভাব করল। শারমিন বলল, চা বানিয়ে আনছি। গল্প করতে করতে চা খাবে, তারপর অফিসে যাবে।

কী গল্প করব ?

তোমার যা ইচ্ছা। আগে আমাকে একটা ঠান্ডা চুমু খাও।

ঠান্ডা চুমুটা কী ?

শারমিন উৎসাহের সঙ্গে বলল, এক টুকরা বরফ অনেকক্ষণ ঠোঁটে ধরে রাখবে। ঠোঁট ঠান্ডা হয়ে যাবে। সেই ঠোঁটে চুমু।

ইমন বলল, গরম চুমুর সময় কি ঠোঁট তাওয়ায় লাগিয়ে গরম করে নিতে হবে ?

শারমিন জবাব দিল না।

ইমনের বিয়ে হয়েছে পনেরো মাস আগে। ভালোবাসাবাসির বিয়ে না, মুরুব্বিদের আলাপ-আলোচনার বিয়ে। বিয়ের মূল ঘটক ইমনের বড় চাচা আফতাব উদ্দিন। উনি বলেছিলেন, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সবচেয়ে রূপবতী মেয়ের নাম— ঐশ্বরিয়া রায়। ঐশ্বরিয়ার রূপকে আড়াই দিয়ে গুণ দিলে যে জিনিস হয় তার নাম শারমিন। বুঝেছিসরে গাধা!

==========================================

ইমন বলেছিল, এত রূপবতী মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হবে না মামা।

ঠিক হবে না কেন ?

রূপবতীদের মধ্যে নার্সিসাস কমপ্লেক্স দেখা যায়। তারা নিজের রূপের প্রেমে পড়ে, অন্য কারো প্রেমে পড়তে পারে না।

গাধার মতো কথা বলবি না। বিয়ে ঠিক করেছি বিয়ে কর। মেয়ে নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে বই কিনতে যাবে। তুইও যাবি। টুকটাক কথা বলে দেখবি দু'জনের দু'জনকে পছন্দ হয় কি-না।

নিউমার্কেটে বিশেষ বইয়ের দোকানে ঢুকে ইমন হতভম্ব। জলপরী ধরনের এক মেয়ে (চোখে সানগ্লাস) একগাদা বই কিনে ফেলেছে এবং আরো কিনছে। ইমনকে ঢুকতে দেখে সে চোখ থেকে সানগ্লাস নামিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আপনার নাম ইমন ?

ইমন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। জলপরী বলল, আমার নাম শারমিন। বইগুলি ধরুন তো।

ইমন বই ধরল। মেয়েটি দোকানের লোকজন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, আমি বাসা থেকে বের হবার সময় ঠিক করে বের হয়েছিলাম যদি ইমন সাহেব হালকা গ্রিন কালারের শার্ট পরে আসে তাহলে আমি বলব 'ইয়েস'। অন্য যে-কোনো কালারের শার্ট পরে এলে বলব 'নো'।

ইমনের শার্টটার রঙ ছিল হালকা সবুজ।

তারা বই নিয়ে এক চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেতে গেল। ইমন বলল, বিয়ের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত কি শার্টের রঙ দেখে নেয়া ঠিক ?

শারমিন বলল, অবশ্যই ঠিক। আমার মেজখালা এইভাবে সিদ্ধান্ত নেন এবং তার সব সিদ্ধান্ত ঠিক হয়।

শারমিন এবং ইমন নিউ ইস্কাটনে একটা ফ্ল্যাটে বাস করে। তাদের সংসার গুলশান থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন শারমিনের মেজখালা, নাম রুবি।

শারমিনের ফ্ল্যাটের দেয়ালের রঙ, ফার্নিচার, জানালার পর্দা সবই রুবি খালা ঠিক করে দিয়েছেন। কখন কী রান্না হবে এইটিও রুবি খালা ঠিক করে দেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে শারমিন টেলিফোন করে, রুবি খালা, আজ দুপুরে কী রান্না করা যায় বলো তো ?

ফ্রিজে কী আছে ?

মাংস মাছ দু'টাই আছে।

ঘনঘন মাংস খাওয়া ঠিক না। কাল রাতে মাংস খেয়েছিস। আজ মাছ কর। কী মাছ আছে ?

ইলিশ মাছ আছে, এক প্যাকেট কাতল আছে। ছোটমাছ আছে। মলামাছ।

কাঁচা টমেটো দিয়ে ছোটমাছ কর। তোর কাজের মেয়েটাকে টেলিফোন ধরতে বল, আমি রেসিপি বলে দিচ্ছি।

যে মেজখালার এতটাই প্রভাব তিনি ম্যাসাজ করাবেন আর শারমিন করাবে না তা কী করে হয় !

বুধবারে MM অর্থাৎ মিস মনোয়ারা চলে এলেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বোরকায় ঢাকা। বিশাল বলশালী মহিলা। কুস্তিগিরের মতো লোমশ হাত। লম্বা লম্বা আঙুল। জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার অভ্যাস আছে। গা দিয়ে জর্দার মিষ্টি গন্ধ আসছে। মিস মনোয়ারা বোরকা খুলতে খুলতে বললেন, ঠিকমতো ম্যাসাজ করাতে হলে লজ্জা দূর করতে হবে। লজ্জা নিয়ে ম্যাসাজ হবে না। মানুষের শরীরে দুইশ' আঠারোটা নার্ভ এন্ডিং আছে। প্রতিটা নার্ভ সেন্টারে ম্যাসাজ হলে তবে শরীরের Balance ঠিক হবে। আমার কিছু জিনিস লাগবে। এক গামলা গরম পানি, অলিভ ওয়েল আর একটা পাতলা কাপড়ের টুকরা। যদি না থাকে পুরনো গামছা হলেও চলবে।

যোগাড়যন্ত্রের পর ম্যাসাজ শুরু হলো। কাজের মেয়ে ফুলির খুব উৎসাহ কর্মকাণ্ড কী হচ্ছে দেখবে। সেই সুযোগ হলো না। কারণ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

মিস মনোয়ারা ম্যাসাজ শুরু করেই বলল, লজ্জা লাগলে চোখ বন্ধ করে ফেলবেন। প্রথম দিনে একটু লজ্জা লাগবে, তারপর আর লাগবে না। স্বামীর সঙ্গে প্রথম রাত কাটানোর সময় লজ্জা থাকে। তারপর আর থাকে না।

ম্যাসাজের পুরো সময়টা শারমিন চোখ বন্ধ করে থাকল। এবং তার বুক সারাক্ষণই ধড়ফড় করতে থাকল। এ-কী কাণ্ড !

একমাস পার হয়েছে। শারমিন এখন সপ্তাহে একদিনের জায়গায় দুদিন ম্যাসাজ করাচ্ছে। বুধবার এবং সোমবার। এই দুটো দিনের জন্যে সে মনে মনে অপেক্ষা করে থাকে। মিস মনোয়ারা ম্যাসাজের ফাঁকে নানান গল্পও করেন। গল্পগুলি শুনতে ভালো লাগে। কিছু কিছু গল্প খুবই অশ্লীল। শুনলে গা শিউরে ওঠে। শারমিন ঠিক করে রেখেছে— একদিন বলবে যেন এ ধরনের গল্প আর না করা হয়। এখনো বলা হয় নি।

এক শুক্রবারের কথা। ইমনের অফিস নেই। সে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। শারমিন সাজগোজ করছে। শুক্রবারে সে মেজখালার বাসায় যায়। সারাদিন থেকে সন্ধ্যায় ফেরে। ইমন যায় না। এই নিয়ে প্রতি শুক্রবারেই দুজনের কথা কাটাকাটি হয়। আজও যে হবে এই বিষয়ে শারমিন নিশ্চিত। কারণ ইমনের মুখ গম্ভীর। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে রাগে ফুঁসছে।

ইমন ভাঁজ করে খবরের কাগজ রাখতে রাখতে চাপা গলায় ডাকল, শারমিন, শুনে যাও।

==========================================

শারমিন পাশে এসে দাঁড়াল।

ইমন বলল, তুমি খবরের কাগজ পড় না। তাই না ?

শারমিন বলল, পড়ি না। টিভি চ্যানেলে খবরও দেখি না। তাতে সমস্যা কী ?

কোনো সমস্যা নেই, তবে আজ কাগজে একটা মজার খবর ছিল।

শারমিন বলল, মজার খবর তুমি পড়ে মজা পাও। আমার মজার দরকার নেই।

ইমন বলল, আবদুল মজিদ নামে এক লোককে নিয়ে একটা স্টোরি করেছে। সে মিস মনোয়ারা নাম নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদের ম্যাসাজ করে বেড়াত। তার একটা ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিটা দেখ।

শারমিন অনেকক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তার হাত-পা কাঁপছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি সে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যাবে।

ইমন বলল, পুলিশ এই লোককে ছেড়ে দিয়েছে, কারণটা কী জানো ? কোনো মেয়ে এই লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজি না। তুমি কি সাক্ষ্য দেবে ?

শারমিন বলল, না।

সে মেজখালার বাড়িতে গেল না। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করল না। বাথটাবে শরীর ডুবিয়ে সারাদিন শুয়ে রইল এবং মাঝে মাঝে চিৎকার করে কাঁদল।

ইমন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। কোমল গলায় বলল, যা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে মাথা গরম করার কিছু নেই। তুমি তো জেনেশুনে কিছু কর নি। মনটা ঠিক কর, চল দু'জনে মিলে কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করি। যাবে ? শারমিন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, না।

আজ সোমবার। ম্যাসাজের দিন।

সকাল থেকেই শারমিনের অস্থির লাগছে। অনেক চেষ্টা করেও সে অস্থিরতা দূর করতে পারল না। একসময় সে টেলিফোন করল।

হ্যালো! মিস মনোয়ারা ?

ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলল না।

মিস মনোয়ারা ?

হুঁ।

আমি শারমিন। আজ ম্যাসাজের দিন। আপনি আসবেন না ?

আসতে বলছেন ?

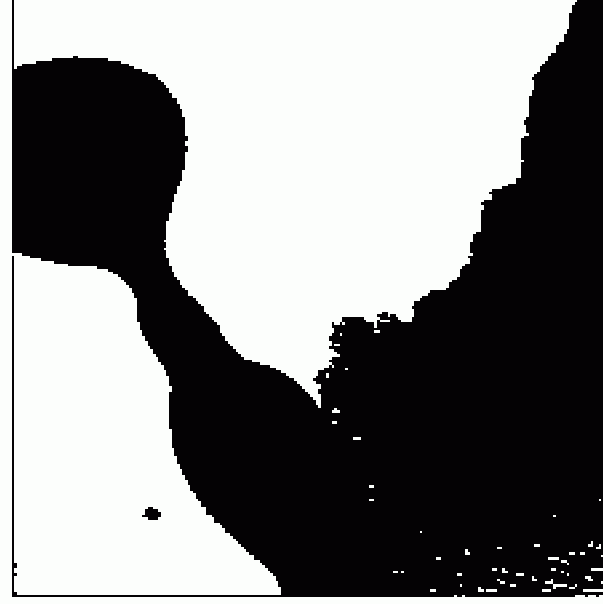
হুঁ।

আচ্ছা, চলে আসছি।

শারমিন অপেক্ষা করছে। তার শরীরের দু'শ আঠারোটা নার্ভ এন্ডিং ছটফট করছে। শরীর জ্বলে যাচ্ছে।

এত দেরি হচ্ছে কেন ? কখন আসবে মিস মনোয়ারা ?

==========================================



# কাকারু

আশরাফুদ্দিন কাঁটাবনে পাখির দোকানে গিয়েছেন 'কাক' কিনতে। তার মেয়ে সুমির জন্মদিনে তিনি একটা কাক উপহার দিবেন। সুমির আগামী বুধবারে দু'বছর পূর্ণ হবে। জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা হবে শুক্রবারে। বুধবারে আত্মীয়স্বজনদের অফিস-কাচারি আছে। শুক্রবার ছুটির দিন। সবাই আসতে পারবে।

সুমির প্রথম জন্মদিনটা করা হয় নি। বেচারির হয়ে গেল নিউমোনিয়া। যমে-মানুষে টানাটানি এমন অবস্থা। এক পর্যায়ে শিশু হাসপাতালের ডাক্তার বলে বসলেন, অবস্থা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না। তবে ঘাবড়াবার মতো তেমন কিছু হয় নি। নিউ জেনারেশন ড্রাগ পড়েছে। ইনশাআল্লাহ রেসপন্স করবে। সবই আল্লাহর হাতে।

ডাক্তার যখন বলেন, সবই আল্লাহর হাতে, তখন কলিজা নড়ে যায়। আশরাফুদ্দিনের কলিজা নড়ে গেল। তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব মানত করলেন। যেমন, মেয়ে যদি বেঁচে যায় বাকি জীবনে তিনি ভাত খাবেন না। রুটি খাবেন। ভাত তার অতি পছন্দের খাদ্য। তিনি সকালের নাস্তাতেও ভাত খান। মেয়ের জন্যে অতি পছন্দের খাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

তার দ্বিতীয় মানত হলো, পান খাবেন জর্দা ছাড়া।

তৃতীয় মানত, বাকি জীবন বালিশ ছাড়া ঘুমাবেন।

সুমির বয়স দুবছর হতে চলেছে। তিনি প্রতিটি মানত মেনে চলছেন। বাকি জীবন মেনে চলবেন— এই তার প্রতিজ্ঞা। তিনি তার মেয়ের কোনো অমঙ্গল চান না।

আশরাফুদ্দিনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের পেছনে একটা ঘটনা থাকে। জন্মদিনে কাক উপহার দেবার পেছনেও একটা ঘটনা আছে। ঘটনাটা এরকম—

হাসপাতাল থেকে সুমিকে ছেড়েছে। তিনি মেয়েকে কোলে নিয়ে

=====================================

হাসপাতালের বারান্দায় এসেছেন। বারান্দার রেলিং-এ তিন-চারটা কাক বসেছিল। সুমি হঠাৎ কাকগুলির দিকে আঙুল তুলে পরিষ্কার গলায় বলল, কাক। সুমির প্রথম শব্দ উচ্চারণ। সব শিশুই মা, বাবা, দুদু এইসব বলতে শিখে। সুমি শিখল কাক। সুমির মা নতুন শব্দ শেখানোর অনেক চেষ্টা করল— মা, বলো 'বাবা'। বলো 'বাবা'।

সুমি বলল, কাক।

তুমি কত লক্ষ্মীমেয়ে। তুমি সব কথা বলতে পার। বলো তো মা— পানি।

সুমি গম্ভীর গলায় বলল, কাক।

এখন অবশ্যি সুমি সব কথা বলতে পারে। কঠিন কঠিন শব্দও বলে। যেমন, কিছুদিন আগে সে তার বাবাকে বলল, বাবা, তুমি অত্যধিক গরিব।

অত্যধিক শব্দটা নিশ্চয়ই কারো কাছ থেকে শুনে শিখেছে। মেয়ের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, যা শুনছে সবই শিখে ফেলছে। সুমির কথাবার্তা আশরাফুদ্দিনের এত ভালো লাগে! এক-একবার আনন্দে চোখে পানি এসে যায়। মেয়েটির প্রতি অতিরিক্ত মমতা যখনি তৈরি হয় তখনি তিনি মেয়ের গায়ে হালকা করে থুতু দেন। এতে ভালোবাসার নজর কাটা যায়। পিতামাতার নজর বড় কঠিন জিনিস। ব্যাপারটা পরীক্ষিত। গত শীতের সময় চারদিকে জ্বরজারি হচ্ছে। সুমি দিব্যি সুস্থ। একদিন তিনি বললেন, বাহ, আমার মেয়েটার শরীর স্বাস্থ্য তো ভালো যাচ্ছে। সুমির মা বললেন, এইসব কী কথা ! তুমি দেখি মেয়েটাকে নজর লাগাবে। বলো মাশাল্লাহ্। তিনি বললেন, মাশাল্লাহ্। এতে লাভ হলো না— সেদিন সন্ধ্যা থেকেই সুমির জ্বর। বেচারি এক সপ্তাহ জ্বরে ভুগল।

আশরাফুদ্দিন কাজ করেন একটা বড় ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে। ছোট চাকরি, অ্যাসিসটেন্ট ক্যাশিয়ার। অফিস ছুটি হয় পাঁচটায়, রোজই তার অফিস থেকে বের হতে দেরি হয়। হিসাব মিলছে না, লেজার বুকে গণ্ডগোল। প্রতিদিনই কিছু ঝামেলা থাকে। অফিস থেকে বের হতে রোজই ছটা সাড়ে ছটা, কোনোদিন সাতটাও বেজে যায়। অফিস ছুটি হওয়ার পর থেকেই তাঁর মনটা পড়ে থাকে মেয়ের কাছে। যখন বাসার দিকে রওনা হন তখন সারাপথ চিন্তা করতে করতে যান— আজ সুমির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলবেন। সুমিকে রোজ একটা ভূতের গল্পও শোনাতে হয়। সেই গল্পও চিন্তাভাবনা করে বের করতে হয়। একই গল্প যদি কয়েক দিন পরে আবারো বলেন, সুমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। মেয়ের এমন বুদ্ধি— মাশাল্লাহ!

বাসায় ফেরার সময় আশরাফুদ্দিন চেষ্টা করেন মেয়ের জন্যে কিছু কিনতে। লজেন্স, বাদাম, আইসক্রিম।

==========================================

সুমির পছন্দ হাওয়াই মিঠাই। দশ টাকা দাম। আশরাফুদ্দিনের সামর্থ্যের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু হাওয়াই মিঠাই কেনা যাবে না। কারণ সুমির বড়মামা বলেছেন— এইসব জিনিস কখনো খাওয়ানো যাবে না। বাচ্চাদের পেট খারাপ হয়।

আশরাফুদ্দিনের সংসার সুমির বড় মামা মুনিরের নির্দেশেই চলে। তার কারণও আছে। আশরাফুদ্দিন তেরোশ' স্কয়ার ফিটের যে ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন তা মুনিরের। আশরাফুদ্দিন বিনা ভাড়ায় থাকছে। শুধু ইউলিটির চার্জ দিচ্ছেন। বিপদে-আপদেও মুনিরকে পাওয়া যায়।

একবার অফিসে ক্যাশে বিরাট গরমিল ধরা পড়ল। পাঁচ লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা ড্রয়ার থেকে গায়েব। দায়িত্ব এসে পড়ল আশরাফুদ্দিনের কাঁধে। অফিসের এম ডি হারুন সাহেব তাকে ডেকে বললেন, আপনি অনেকদিন এই অফিসে কাজ করছেন। আপনাকে আমরা একজন অনেস্ট এবং সিনসিয়ার কর্মচারী হিসেবে জানি বলেই কোনো পুলিশ কেইস করছি না। আপনাকে আমরা সাতদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন। আমরা কোনো প্রশ্ন করব না। ধরে নেব কোনো কিছুই ঘটে নি। আগে যেভাবে কাজ করতেন সেভাবেই কাজ করবেন।

হতভম্ব আশরাফুদ্দিন বললেন, টাকা কোথায় পাব স্যার ?

হারুন সাহেব বললেন, আপনি টাকা কোথায় পাবেন আপনি জানেন। টাকা ছিল আপনার Custody-তে। সব দায়-দায়িত্ব আপনার। সাতদিন অনেক সময়। আমি নিশ্চিত এই সাতদিনে কোনো একটা ব্যবস্থা হবে। যদি না হয় তাহলে পুলিশের কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের হাতে অন্য অপশন নেই। যদিও আমি চাই না আমাদের অফিসের কেউ জেল খাটুক।

টাকার জোগাড় সাতদিনেই হলো। সুমির বড় মামা গম্ভীর মুখে টাকাটা দিলেন এবং বললেন, আপনি বিরাট ক্যালাস মানুষ। বোকা এবং ক্যালাস। আপনার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় আমার বোনের জীবনটা নষ্ট হয়েছে। আপনি শুধু যে অপদার্থ তা-না, অপদার্থদের অপদার্থ। ...

আশরাফুদ্দিন মুখ হাসি হাসি রাখার চেষ্টা করতে করতে সব কথা শুনলেন। মুখ হাসি হাসি রাখাটা ঠিক হয় নি। সুমির বড়মামা এক পর্যায়ে বললেন, আপনি হাসছেন কী মনে করে জানতে পারি ? রং তামাশার কোনো ব্যাপার কি ঘটেছে ?

বড় মানুষদের কোনো কথা ধরতে নেই। সেই বড় মানুষ যদি আত্মীয় হন তাহলে তো আরো না। আশরাফুদ্দিন সুমির বড়মামার কোনো কথা ধরেন না। কোনো অপমান গায়ে মাখেন না। শুধু যখন বাসায় ফিরে শোনেন সুমির বড়মামা এসে সুমিকে নিয়ে গেছে, আজ সুমি মামার বাসায় থাকবে, তখন বড় খারাপ লাগে। দুঃখে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

=========================================

সুমির জন্মদিন নিয়ে আশরাফুদ্দিন ভালো দুশ্চিন্তায় আছেন। তিনি উড়া উড়া শুনছেন, জন্মদিন পালন করা হবে সুমির বড়মামার উত্তরার বাড়িতে। (ডুপলেক্স বাড়ি। বারান্দা থেকে লেক দেখা যায়। সুমি ঐ বাড়িতে যেতে খুবই পছন্দ করে।) সত্যি সত্যি যদি উত্তরার বাড়িতে জন্মদিন হয় তাহলে সেখানে তাকে অবশ্যই যেতে হবে, তবে জন্মদিনের উপহার কাক নিয়ে যেতে পারবেন না। কাক দেখলে অনেক আজেবাজে কথা সুমির মামা বলে বসতে পারেন। একটা উপহার কিনে দিতে না পারা দুঃখের ব্যাপার।

কাটাবনের পাখির দোকানের মালিক বলল, কাক কিনতে চান ?

জি।

কাক ? কাউয়া ?

জি কাউয়া।

কাউয়া দিয়ে করবেন কী ?

জন্মদিনে উপহার দিব।

উপহার কাউয়া দিবেন কেন ? লাভ বার্ড নিয়ে যান। জোড়া তিনশ' টাকা। খাঁচা ফ্রি।

আমার কাউয়াই দরকার।

আমরা কাউয়া বেচি না।

বেচেন না কেন ?

কাউয়া পাখির মধ্যে পড়ে না।

পাখির মধ্যে পড়বে না কেন ? কাক তো উড়তে পারে। কা কা করে গানও গায়।

আপনি অন্য দোকানে যান। কাক কিনে কাকের গান শুনুন।

আশরাফুদ্দিন কোথাও কাক পেলেন না। শুধু এক দোকানি বলল, তারা কাক এনে দেবে, তবে এক হাজার টাকা খরচ লাগবে। পাঁচশ' টাকা অ্যাডভান্স।

কাকের দাম এক হাজার টাকা ?

দোকানি গম্ভীর গলায় বলল, জি, এক হাজার। কাক ধরা কঠিন ব্যাপার। কাক ধরতে গিয়ে ঠোকর খেয়ে মানুষ মারা গেছে, এটা জানেন ?

আশরাফুদ্দিন বললেন, পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত দিতে পারব। এর বেশি পারব না। ভাই, আমি গরিব মানুষ।

দোকানি বলল, আগামীকাল আসেন। দেখি কাক জোগাড় করতে পারি কি না। তবে কথা দিতে পারব না। পাঁচশ' টাকা দিয়ে যান। কাক না পাওয়া গেলে ফেরত নিবেন।

==========================================

আশরাফুদ্দিন পাঁচশ' টাকা জমা দিলেন। তার জন্যে অনেকগুলি টাকা। তা হোক, মেয়েটা খুশি হবে। মেয়ের খুশির কাছে এই টাকা সামান্য। পাঁচশ' টাকা জমা দিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। কাক পাওয়া না গেলে টাকাটা কি ফেরত পাওয়া যাবে ? টাকা আদায় করা খুব কষ্ট।

শেষ পর্যন্ত কাক পাওয়া গেল। দাম পড়ল পাঁচশ' সত্তর। পাঁচশ' টাকা কাকের দাম, সত্তর টাকা খাঁচার দাম। দোকানি বলল, ভালো জিনিস পাইছেন অল্প পয়সায়।

আশরাফুদ্দিনের কাছেও মনে হলো তিনি ভালো জিনিস পেয়েছেন। স্বাস্থ্যবান কাক। গায়ের পালক চকচক করছে। চোখ ঘন লাল। কাকের চোখ এমন লাল হয় তিনি জানতেন না। এত কাছ থেকে এর আগে তিনি কাক দেখেনও নি। এই বিশেষ পাখিটা মানুষের আশেপাশেই থাকে, তবে কখনোই খুব কাছে আসে না।

আশরাফুদ্দিন তার ফ্ল্যাট বাড়ির কলিং বেল টিপলেন ভয়ে ভয়ে। সুমির মা দরজা খুলে কাক দেখে কী বলবে কে জানে! হৈচৈ যে করবে বলাই বাহুল্য। তৎক্ষণাৎ কাক ছাদে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসতেও পারে। মেয়েদের কাছে কাক অমঙ্গলে পাখি।

দরজা খুলল কাজের ছেলে রফিক। সে দাঁত বের করে বলল, বাড়িতে কেউ নাই। নাই নাই নাই।

আশরাফুদ্দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গেছে কোথায় ? সুমির বড়মামার বাড়িতে ?

হুঁ। রাইতে থাকবে।

আশরাফুদ্দিন বললেন, অসুবিধা নাই। থাকুক। ঐ বাড়ির সব ঘরে এসি। সুমি আরাম করে ঘুমাবে।

আপনার হাতে এইটা কী ? কাউয়া না ?

হুঁ।

কাউয়া দিয়া কী করবেন ?

এমনি আনলাম। সুমি খেলবে।

ঠোকর দিবে তো।

ঠোকর দিলে দিবে। একটা শিশুর নানান ঠোকর খেয়ে বড় হওয়া দরকার। তুমি কাকটার জন্যে পানি দাও। আর কিছু খাবার।

রফিক বলল, কাউয়ার খানা কই পামু কন! কাউয়া খায় আবর্জনা।

ভাত আছে না ? ভাত দাও। আর আমাকে এক কাপ চা দাও।

==================================================

আশরাফুদ্দিন কাক নিয়ে তার ঘরে ঢুকে গেলেন। তিনি পশ্চিমের ঘরটায় থাকেন। সুমি তার মার সঙ্গে শোবার ঘরে ঘুমায়।

আশরাফুদ্দিন রাতের খাবার খেলেন। আয়োজন ভালো না, তবে তৃপ্তি করে খেলেন। অনেক দিন পর আরাম করে টিভি দেখলেন। একটা হাসির নাটক। তিন বন্ধুর কীর্তিকলাপ। তিন বন্ধুর একজন মহাবোকা। বোকাটার কাণ্ড দেখে আশরাফুদ্দিন শব্দ করে হাসলেন। সুমির মা থাকলে তিনি শব্দ করে হাসেন না। সে যে রাগ করে তা না। তারপরও কেন যেন হাসি আসে না।

আশরাফুদ্দিনের স্বভাব, গরমেও মশারি খাটিয়ে ঘুমানো। মশারি না টাঙালে তার নাকি নেংটা নেংটা লাগে। সুমির মা আবার মশারির ভেতর ঘুমাতে পারে না। তার দম বন্ধ লাগে। তাদের শোবার ব্যবস্থা এই কারণেই আলাদা। আশরাফুদ্দিন মশারির ভেতর ঢুকতে যাচ্ছেন, ঠিক তখন খাঁচার ভেতরের কাকটা ছটফট করে ডানা ঝাপ্টালো। এবং পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল, হ্যালো স্যার। ঘুমিয়ে পড়লেন না-কি ?

আশরাফুদ্দিনের মনে হলো তিনি ভুল শুনেছেন। এরকম ভুল মানুষের মাঝে-মধ্যে হয়। আশেপাশে কেউ নেই, তারপরেও মনে হয় কেউ-একজন কথা বলেছে। আশরাফুদ্দিন ভীত গলায় বললেন, কে ? কে কথা বলে ?

কাকটা বলল, স্যার আমি। আপনার কাজের ছেলেটা আমাকে পানি দেয় নাই। তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছি। কোনো খাবারও দেয় নাই। সে যে বলেছে আমরা আবর্জনা খাই এটা ঠিক না। খাবার পাই না বলে আবর্জনা খাই। শখ করে আবর্জনা কেন খাব ?

আশরাফুদ্দিন কাঁপা গলায় বললেন, তুমি কি সত্যি সত্যি কথা বলছ ?

জি স্যার। কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। বিপদে পড়ে বললাম। তৃষ্ণায় জান যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সব কাকই কি কথা বলতে পারে ?

কাক বলল, স্যার আগে পানি খাওয়ান, তারপর অন্য আলাপ।

আশরাফুদ্দিন পানি আনলেন। টেবিলে ভাত ঢাকা দেয়া ছিল। ভাত আনলেন। একটা কলা আনলেন। এবং সারাক্ষণই মনে মনে বললেন, কোনো কারণে ধান্দা লেগে গেছে বলে এরকম মনে হচ্ছে। কাক কেন কথা বলবে ? হযরত সোলায়মান আলায়েস সালাম পশুপাখির কথা বুঝতেন। তিনি তো সোলায়মান নবী না।

খাঁচার ভেতর রাখা কনডেন্সড মিল্কের খালি কৌটায় পানি ঢালা হলো।

================================

কাকটা ঠোঁট ডুবিয়ে ডুবিয়ে অনেকক্ষণ পানি খেল। একসময় আশরাফুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্তর টাকা দিয়ে এমন এক খাঁচা কিনেছেন, মাথা উঁচা করে বসতেও পারতেছি না। একশ' টাকার খাঁচা একটা কিনলে আরাম করে বসতে পারতাম। ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে।

খাঁচা খুলে দেই ?

কাক বলল, দেন। আর কলাটা ছিলে দেন।

আশরাফুদ্দিন খাঁচা খুলে দিলেন। কাক খাঁচা থেকে বের হয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে মেঝেতে কিছুক্ষণ হাঁটল। ডানা ঝাপ্টালো। আশরাফুদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন, মনে হয় আমার মাথায় কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।

কাক বলল, অসম্ভব কিছু না। গরম পড়েছে মারাত্মক। গরমের কষ্ট এবং নানাবিধ চিন্তায় মাথায় গণ্ডগোল হওয়া স্বাভাবিক। আপনাদের ডাক্তার কবিরাজ কত কিছু আছে। আমাদের কিছুই নাই।

আশরাফুদ্দিন বললেন, মানুষের মতো কথা কি তুমি একাই বলতে পার, নাকি অন্য কাকরাও পারে ?

কাক কলা খেতে খেতে বলল, আমরা সবাই পারি। আমরা সবসময় থাকি মানুষের কাছাকাছি। ওদের ভাষা শিখব না ?

তাহলে অন্যরা কথা বলে না কেন ?

কাক বলল, সব কাক কথা বলা শুরু করলে উপায় আছে ? কা কা বলে দুবার ডাকলেই আপনারা বলেন, গৃহস্থের অমঙ্গল। সেখানে যদি কথা বলা শুরু করি...। বাজে আলাপ বন্ধ থাকুক, আপনার মেয়ে কই ? যার জন্যে আমাকে কিনেছেন, তাকে তো এখনো দেখলাম না।

সে তার বড়মামার বাড়িতে। জন্মদিনের অনুষ্ঠান সেই বাড়িতেই হবে।

আপনি কি সেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন ?

আশরাফুদ্দিন বললেন, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কী বলো ?

কাক নিয়ে উপস্থিত হওয়া ঠিক হবে না। কাককে আপনারা বলেন অশুভ। জন্মদিন একটা শুভ অনুষ্ঠান।

ঠিক বলেছ। সুমির বড়মামা সবার সামনে আমাকে পাগল-টাগল বলে বসতে পারে। হঠাৎ বড়লোক হয়েছে তো, আমাকে খুবই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। এমন লজ্জা পাই! সেদিন একগাদা লোকের সামনে বলল, আপনি অপদার্থের শিরোমণি।

কাক বলল, শিরোমণি কী জিনিস ?

==========================================

শিরোমণি মানে সেরা। আমি না-কি অপদার্থের সেরা।

কাক বলল, মুখের উপর বলে দেন—

কা কা কা<br>
তুই গু খা।

আশরাফুদ্দিন বললেন, ছিঃ ছিঃ, এইসব কথা কীভাবে বলি ? আমার স্ত্রীর বড় ভাই। বিপদে আপদে সাহায্য করে।

কী সাহায্য করে ?

তার কারণে জেলের হাত থেকে বেঁচেছি। বিরাট ইতিহাস, শুনবে ?

মানুষের ইতিহাস শুনে আমার লাভ কী। ঠিক আছে বলতে চাচ্ছেন বলুন।

আশরাফুদ্দিন আগ্রহ নিয়ে অফিসে টাকা-পয়সার গণ্ডগোলের গল্প শুরু করলেন। কাকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সেও খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। মাঝে মাঝে হুঁ বলছে। মাথা নাড়ছে। আশরাফুদ্দিনের মনে হলো এত আগ্রহ নিয়ে এর আগে কেউ তার দুঃখের গল্প শোনে নি।

কাক বলল, টাকাটা ছিল কোথায় ?

আমার ড্রয়ারে ছিল। ব্যাংকে জমা দিতে গিয়েছিলাম। তিনটার পরে গিয়েছি বলে জমা দিতে পারি নাই। ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম।

তালা দেয়া ছিল না ?

ছিল।

চাবি আপনার কাছে ?

হ্যাঁ।

আর কারো কাছেই চাবি নাই ?

হেড ক্যাশিয়ার ফরিদ সাহেবের কাছে একটা চাবি আছে।

কাক বলল, টাকাটা ঐ ব্যাটা কি নিয়েছে ?

আশরাফুদ্দিন বললেন, অসম্ভব। উনি ফেরেশতার মতো মানুষ। নামাজ কালামের মধ্যে থাকেন।

ফেরেশতাও তো মাঝে মধ্যে ভুল করে।

তা অবশ্যি করে। দু' একবার যে আমার এরকম মনে হয় নাই তা না। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে টেলিফোন করে জিজ্ঞাস করি। পরেই মনে হয় ছিঃ ছিঃ।

কাক বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ করার কিছু নাই। এখনই টেলিফোন করুন।

এখন করব ?

হুঁ। কী বলতে হবে আমি শিখিয়ে দিব।

==========================================

আশরাফুদ্দিন টেলিফোন করলেন। ফরিদ সাহেবই টেলিফোন ধরলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কে ?

স্যার আমি। আশরাফুদ্দিন। ভালো আছেন স্যার ?

এত রাতে! কী ব্যাপার ? আমি শুয়ে পড়েছিলাম তো।

আশরাফুদ্দিন রিসিভার চাপা দিয়ে ধরে রেখে ফিসফিস করে কাকটাকে বললেন, কী বলব ? স্যার তো খুব রাগ করছেন।

কাক বলল, বলুন কা কা কা। তুই গু খা।

আশরাফুদ্দিন হতাশ গলায় বললেন, এটা কী করে বলব ?

কাক বলল, স্পষ্ট গলায় বলবেন।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে বিরক্ত গলায় ফরিদ সাহেব বললেন, কী বলবেন বলুন।

আশরাফুদ্দিন বললেন, কা কা কা। তুই গু খা।

ফরিদ সাহেব বললেন, কী বললেন ?

আশরাফুদ্দিন কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, স্যার, আমি বলেছি— কা কা কা। তুই গু খা।

What ?

আশরাফুদ্দিন টেলিফোন রেখে দিলেন। তাঁর দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। আগামীকাল অফিসে কী হবে কে জানে ? ফরিদ সাহেব নিশ্চয়ই কমপ্লেন করবেন। বড় সাহেব তাকে ডেকে পাঠাবেন। তারপর ? বদ কাকটার কথা শোনা উচিত হয় নাই। দুশ্চিন্তায় আশরাফুদ্দিনের ঘুম হলো না। মাঝে মাঝে ঝিমুনির মতো আসে, তখন বিকট সব স্বপ্ন দেখেন। একটা স্বপ্নে দশ-বারোটা কাক তাকে ঠোকর দিচ্ছে। তিনি ব্যথা পাচ্ছেন না, তবে কাতুকুতু লাগছে।

আশরাফুদ্দিন খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগেই, ঘুম থেকে উঠেন। আজ শেষ রাতে ঘুমিয়েছেন বলেই নয়টার দিকে ঘুম ভাঙল। ঘুম ভেঙে দেখেন, রফিক দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলল, আপনার হইছে কী ? শরীর খারাপ ?

না।

স্যার, আপনের কাউয়া পালায়া গেছে। কী বুদ্ধি! নিজে নিজেই তার কাইটা পালাইছে। বদ পক্ষী।

আশরাফুদ্দিন কিছু বললেন না। রফিক বলল, অফিসে যাবেন না ?

যাব।

আইজ সুমি আফার জন্মদিন। আপনেরে সকাল সকাল অফিস থাইকা ফিরতে বলছে।

আচ্ছা।

বড়মামার বাড়িতে চইলা যাইতে বলছে।

আচ্ছা।

ভালো 'ডেরেস' পইরা অফিসে যাইতে বলছে।

আচ্ছা।

অফিসে আশরাফুদ্দিন অত্যন্ত টেনশনে কাটালেন। সারাক্ষণ মনে হলো এই বুঝি ফরিদ সাহেব ডাকবেন। কয়েকবার তার সঙ্গে দেখাও হলো। ফরিদ সাহেব একবার শুধু বললেন, কাল রাতে কি আপনি টেলিফোন করেছিলেন ? আশরাফুদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন, ইয়েস স্যার। ফরিদ সাহেব কিছুই বললেন না। ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আশরাফুদ্দিন মনে মনে বললেন, হে আল্লাহপাক, তোমার পাক দরবারে হাজার শুকরিয়া।

আজকের দিনটা মনে হয় আশরাফুদ্দিনের জন্যে ভালো। সুমির বড়মামার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শুনলেন, মুনির জরুরি কাজে আজ সকালের ফ্লাইটে চিটাগাং গিয়েছেন। আগামীকাল ফিরবেন। সুমির মা মন খারাপ করে বলল, ভাইজান জন্মদিনের জন্যে এত কিছু করলেন আর নিজেই থাকতে পারলেন না।

আশরাফুদ্দিন বললেন, ভেরি স্যাড।

সুমির মা বললেন, জন্মদিন আমি একদিন পিছিয়েছি। ভাইজান আসলে হবে।

আমি কি চলে যাব ?

খাওয়াদাওয়া করে যাও। মনু বাবুর্চিকে দিয়ে মোরগপোলাও রান্না করানো হয়েছে।

নিতান্তই অনিচ্ছার সঙ্গে আশরাফুদ্দিন বললেন, আচ্ছা।

রাত নটায় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আশরাফুদ্দিন মোরগপোলাও খেতে বসলেন। খাওয়ার সময় মেয়ের সঙ্গে নিচু গলায় অনেকক্ষণ কথা বললেন।

সুমি বলল, বাবা, আমার জন্যে কী কিনেছ ?

কাক কিনেছি।

সত্যি ?

হুঁ। কাকটা কথা বলতে পারে।

কই দেখি।

সঙ্গে আনি নাই।

==================================================

বাসায় আছে ?

হুঁ।

তোমার ঘরে থাকে ?

হুঁ।

কাল আনবে ?

দেখি আনতেও পারি।

সুমির আনন্দে ঝলমল করা চোখ-মুখ দেখে আশরাফুদ্দিনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মেয়েকে মিথ্যা কথা বলেছেন— কাক নেই, চলে গেছে। এই কথাটা বলা প্রয়োজন ছিল। একটি শিশু বড় হবে সত্যের ভেতর।

কাকটার নাম কী বাবা ?

নাম জিজ্ঞেস করি নাই।

আজ জিজ্ঞেস করবে।

আচ্ছা।

বাবা, তুমি খুব ভালো।

আশরাফুদ্দিনের চোখে পানি এসে গেল। এরকম একটা মেয়ে থাকলে আর কিছুই লাগে না।

আজ ঘুমুতে যেতে একটু দেরি হলো। অনেক হিসাব-নিকাশ করলেন মেয়েটার জন্যে আরেকটা কাক কেনা যায় কি-না। খাঁচার দাম লাগবে না। খাঁচা তো আছেই। তবে এই খাঁচাটা বদলে এক সাইজ বড় কেনা দরকার। যাতে কাক বেচারা ঠিকমতো বসতে পারে। ঘাড়ে ব্যথা না হয়।

স্যার কি ঘুমিয়ে পড়েছেন না-কি ?

কাকের গলা। ঠোঁট ফাঁক করে হাই তোলার মতো ভঙ্গি করছে। আশরাফুদ্দিন দ্রুত মশারির ভেতর থেকে বের হলেন। কাকটা জানালায় বসে আছে। আশরাফুদ্দিনের কাছে দৃশ্যটা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হলো না।

কাক বলল, ঐদিন আপনাকে না বলে চলে গেলাম। হঠাৎ মনটা খারাপ হলো। মেয়েটার কথা মনে হলো।

তোমার মেয়ে আছে না-কি ?

এক মেয়ে। সে তার মা'র সঙ্গে থাকে।

কোথায় থাকে ?

কাওরান বাজারে একটা জারুল গাছ আছে। ঐ গাছে আমাদের বাসা। গত সিডরের সময় বাসা ভেঙে গিয়েছিল। এখন রিপেয়ার করেছি।

==========================================

ভালো কথা মনে পড়েছে। তোমার নাম কী ? আমার মেয়ে তোমার নাম জানতে চেয়েছিল। মেয়েকে তোমার কথা বলেছি।

স্যার, আমার কোনো নাম নেই। আমাদের নাম থাকে না। আপনার মেয়েকে বলবেন সুন্দর দেখে একটা নাম দিতে।

আচ্ছা বলব।

কাক গলা নিচু করে বলল, টেলিফোন কি করেছেন স্যার ?

কী টেলিফোন ?

ফরিদ সাহেবকে টেলিফোন। আজ আবার তাকে বলবেন, কা কা কা। তুই গু খা।

একবার তো বলেছি। আর কেন ?

রোজ একবার বলা দরকার।

অসম্ভব। তোমার কথাবার্তা শুনলে অফিসে রিপোর্ট হবে। চাকরি চলে যাবে।

টেলিফোন করতে না চাইলে করবেন না। তবে...

তবে কী ?

কাক নিঃশ্বাস ফেলার মতো ভঙ্গি করে বলল, না থাক। আপনার জানার দরকার নাই।

আশরাফুদ্দিন নিতান্ত অনিচ্ছায় টেলিফোন করলেন। ফরিদ সাহেব বললেন, কে ?

আশরাফুদ্দিন বললেন, স্যার আমি।

কী চান ?

আশরাফুদ্দিন বললেন, কা কা কা। তুই গু খা।

এর মানে কী ?

আশরাফুদ্দিন আমতা আমতা করে বললেন, স্যার, এর মানে আপনাকে গু খেতে বলছে। একটা কাক আপনাকে গু খেতে বলছে।

ফরিদ সাহেব টেলিফোন রেখে দিলেন।

বড় সাহেব আশরাফুদ্দিনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরি কথা বলবেন।

আশরাফুদ্দিন বড় সাহেবের ঘরে এসেছেন। স্যার এখনো বসতে বলেন নি বলে বসতে পারছেন না। ভয়ে তার বুক কাঁপছে। স্যারের ঘরে এসি চলছে। ঘর ফ্রিজের ভেতরের মতো ঠান্ডা। তারপরেও আশরাফুদ্দিনের শরীর ঘামছে। প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে। বড় সাহেব ফাইল দেখছিলেন। ফাইল দেখা বন্ধ করে ঠান্ডা

===================================================

গলায় বললেন, আশরাফ সাহেব, আপনি না-কি রোজ গভীর রাতে টেলিফোন করে হেড ক্যাশিয়ার ফরিদ সাহেবকে গু খেতে বলেন ?

আশরাফুদ্দিন কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, জি স্যার বলি।

কেন বলেন জানতে পারি ?

স্যার, চেয়ারে বসে তারপর বলি ? দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

বসুন।

আশরাফুদ্দিন বসলেন। বড় সাহেব বললেন, এখন বলুন ঘটনা কী ?

স্যার, আমি যে কথাগুলি বলি সেগুলো অন্যায় কথা। ভদ্রসমাজে বলার কথা না। তারপরেও বলি, কারণ কথাগুলো বললে আমার মন শান্ত হয়।

মন শান্ত হয় ?

জি স্যার। টাকা চুরির ব্যাপারে উনি অন্যায়ভাবে আমাকে ফাঁসিয়েছেন। ব্যাংকে টাকা জমা দিতে না পেরে ফিরে এসেছি। উনাকে দিলাম যেন লকারে রাখতে পারেন। উনি বললেন, লকারের চাবি ভুলে আনেন নাই। আমি যেন আমার ড্রয়ারে রেখে দেই। আমি আমার ড্রয়ারে রাখলাম। উনার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাসায় চলে এসেছি। কারণ আমার মেয়েটার খুবই অসুখ, তাকে শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাব। পরের দিন ড্রয়ার খুলে দেখি টাকা নাই। স্যার, এক গ্লাস পানি খাব।

বড় সাহেব তাকে পানির বোতল এবং গ্লাস এগিয়ে দিলেন। আশরাফুদ্দিন পুরো বোতলের পানি খেয়ে ফেললেন। তাতেও তৃষ্ণা মিটল না।

আশরাফুদ্দিন বললেন, পাঁচ বছর আগে স্যার এইরকম আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। আব্দুল জলিল নামের একজন ছিলেন আমি যে পোস্টে সেই পোস্টে। উনার চাকরি চলে যায় তিন লাখ টাকার হিসাবের গরমিলের জন্যে। স্যার, আমি নিশ্চিত ফরিদ সাহেব ঐ ঘটনায় জড়িত।

যখন তদন্ত হচ্ছিল, তখন এইসব কথা তোলেন নাই কেন ?

ফরিদ স্যার সুফি মানুষ। সবাই তাকে মান্য করে। উনার কথাই সবাই বিশ্বাস করে। উনার বিষয়ে কিছু বলার সাহস হয় নাই।

বড় সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তখন সাহস হয় নাই, এখন কেন হয়েছে ?

একটা কাক আমাকে সাহস দিয়েছে স্যার। সে-ই আমাকে ছড়াটা বলতে বলেছে— কা কা কা। তুই গু খা। স্যার, কাকের বিষয়টা বলব ? অদ্ভুত ইতিহাস।

বড় সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, শুনি আপনার ইতিহাস।

==========================================

আশরাফুদ্দিন কাক কেনা থেকে কাকের কথা বলা সবটাই বললেন। কিছুই গোপন করলেন না।

বড় সাহেব বললেন, কাকের কথা বলার বিষয়টা আপনার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। সম্ভবত আপনার সাবকনশাস মাইন্ড একটা ট্রিক প্লে করেছে। তবে ফরিদ সাহেবের বিষয়টা যেন আবার তদন্ত হয় সেটা আমি দেখব।

আমি কি চলে যাব স্যার?

হ্যাঁ চলে যান। রাতদুপুরে মানুষকে ছড়া শোনাবেন না। মন দিয়ে কাজ করুন।

পরের ছ'মাসে বেশ কিছু ঘটনা ঘটল। নতুন তদন্তে প্রমাণ হয়েছে ফরিদ সাহেব টাকাটা চুরি করেছেন। তার চাকরি চলে গেল। ফরিদ আহমেদ পুরো টাকাটা ফেরত দিয়েও চাকরি বাঁচাতে পারলেন না।

এখনকার কথা, পাঁচ বছর আগে জলিল আহমেদ নামে যে অ্যাসিসটেন্ট ক্যাশিয়ারের চাকরি চলে গিয়েছিল তাকে খোঁজা হচ্ছে। কোম্পানি আবার তাকে চাকরি দিতে চাচ্ছে।

আশরাফুদ্দিন হেড ক্যাশিয়ার হয়েছেন। পরীবাগে কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাটে উঠেছেন। সুমির বড়মামার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছিলেন তা ফেরত দিয়েছেন।

আশরাফুদ্দিনের সুখে থাকার কথা। তিনি মোটেই সুখে নেই। কাকটা আর আসছে না। তাঁর মেয়ে কাকটাকে চোখের দেখাও দেখে নাই। বেচারি কাকের জন্যে নাম পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে— 'কাকারু'। সেই নামটা কাকটাকে বলা হয় নি।

প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে দু'দিন আশরাফুদ্দিনকে কারওয়ান বাজারের জারুল গাছগুলির পাশে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা যায়। তিনি শব্দ করে ডাকেন, কাকারু! কাকারু!

লোকজন সন্দেহের চোখে তাকায়। তবে কেউ মাথা ঘামায় না। ঢাকা বিশাল শহর। বিশাল শহরে নানান কিসিমের মানুষজন থাকবে, কেউ গাছের দিকে তাকিয়ে কাকারু কাকারু ডাকবে। কেউ নেংটা হয়ে ট্রাফিক কনট্রোল করবে। এটাই স্বাভাবিক।

==========================================



# পঙ্গু হামিদ

পঙ্গু হামিদের বয়স ষাটের কাছাকাছি। চামড়া ঝুলে গেলেও শক্ত-সমর্থ। এখনো ঝুনা নারিকেলের খোসা মুহূর্তের মধ্যে খুলে ফেলতে পারে। গত কোরবানির সময় সে গরুর সিনা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে, তেমন অসুবিধা হয় নি। তার একটাই অসুবিধা, সে হাঁটাচলা করতে পারে না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হুইল চেয়ারে যেতে হয়। হুইল চেয়ারটা দু'বছর আগের, তবে এখনো নতুন। প্রতিদিন হামিদের ছেলের বৌ ঝাড়পোছ করে। কাউকে হাত দিতে দেয় না। অনেকেই দেখতে আসে। আগ্রহ নিয়ে বলে, সাইকেল চিয়ারটা একটু দেখাও। চলে ক্যামনে ? মেশিং আছে ?

হামিদের ছেলের বৌ মর্জিনা অহঙ্কারী গলায় বলে, মেশিং নাই, হাতে চলে।

আচানক জিনিস বানাইছে গো। কোমর ভাইঙ্গা পইড়া থাকলেও অসুবিধা নাই, সাইকেল চিয়ারে কইরা ঘুরবা। জিনিসটার দাম কত ?

দাম কত জানি না। চেয়ারম্যান সাব সরকার থাইকা বন্দোবস্ত কইরা দিছেন। সাথে খোরাকির টেকাও পাইছেন। কত জানি না।

মর্জিনা জানে না কথাটা ঠিক না। খোরাকির টাকা মাসে একশ' করে পাওয়া যায়। প্রতি তিন মাস পরে পরে চেয়ারম্যান সাহেবের খাতায় টিপসই করে টাকা আনতে হয়।

এলাকার চেয়ারম্যান হাজী শামসুদ্দিন চৌধুরী লোক ভালো। কৌশলের কাজকর্ম তার মতো কেউ জানে না। সে ছাড়া অন্যকেউ হামিদের জন্যে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করতে পারত না। ত্রিশ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, আর চেয়ার এসেছে সতের মাস আগে। হামিদ মুক্তিযুদ্ধে আহত হয় নাই। সে দুই বছর আগে কোমর ভেঙেছে কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে পিছলে পড়ে।

চেয়ারম্যান হাজী শামসুদ্দিন চৌধুরী তিন জায়গায় চিঠি লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ

==========================================

বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদ, দেশ নামের এক এনজিও।

তিনি লিখেছেন, "যাদের জন্যে আজ স্বাধীনতার লাল সূর্য উদিত হয়েছে, ছোরান্তর গ্রামের হামিদ তাদের একজন। আজ হামিদের পরিচয়— পঙ্গু। কোমর ভেঙে সে বিছানায় শুয়ে আছে তিন বছর। ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে সারা জাতি যখন আনন্দ-সাগরে ভাসে, তখন হামিদ ভাসে অশ্রুজলে।

মুক্তিযোদ্ধার সরকারি তালিকায় তার নাম নেই, কারণ সে নামের পিছনে ছুটে নাই। বিশেষ বিশেষ দিনে যখন অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা এসে তাকে কদমবুসি করে গলায় জবা ফুলের মালা পরিয়ে দেয় তখন সে বলে, আমার মানব জন্ম সার্থক।

স্বাধীন দেশে আমরা ছুটাছুটি করে বেড়াব, আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে হায়েনা হিসাবে পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা হামিদ পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদবে। এই কি বিচার ?"

চেয়ারম্যান হাজী শামসুদ্দিনের জ্বালাময়ী প্রতিবেদন এবং নানান জায়গায় ছোটাছুটির কারণে দেশ এনজিও একটা হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করেছে। সঙ্গে এককালীন দশ হাজার টাকা। হাজী শামসুদ্দিন হুইল চেয়ারটা দিয়েছেন, টাকাটা রেখে দিয়েছেন। তিনি হামিদকে বলেছেন, হুইল চেয়ারের সঙ্গে লোক দেখানো কিছু টাকাও দিয়েছে। সেই টাকা আর তোমাকে দিলাম না। হুইল চেয়ার রিলিজ করতে এরচেয়ে বেশি টাকা নিজের পকেট থেকে গেছে। বুঝেছ ?

বিনয়ে গলে গিয়ে হামিদ বলেছে, বুঝেছি স্যার।

হাজী সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, পাবলিকের সেবা করতে গিয়ে নিজে হচ্ছি পথের ফকির। এটা কপালের লিখন ছাড়া আর কিছু না। যাই হোক, চেষ্টায় আছি তোমার জন্যে বয়স্কভাতার ব্যবস্থা যাতে করা যায়। মাসে দুশ' টাকা পাবে আজীবন। এর মধ্যেও ভেজাল আছে। কয়েকজনকে টাকা খাওয়াতে হবে। চারহাজার টাকা পান খাওয়ার জন্যে দিতে হবে। তুমি দুই হাজার দাও। বাকিটা আমি নিজের পকেট থেকে ম্যানেজ করব। পারবা না ?

পারব চেয়ারম্যান সাব।

তোমাদের জন্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে— এখন আমরা যদি কিছু না করি সেটা হবে জাতির প্রতি বেইমানি।

এই ধরনের কথাবার্তা শুরু হলে চেয়ারম্যান সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। আশেপাশে শ্রোতা থাকলে বক্তৃতা থামতেই চায় না, তখন হামিদ বড় অস্বস্তি বোধ করে। কারণ সে কোনোদিনই মুক্তিযুদ্ধ করে নাই। এরচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, সে নাম

==========================================

লিখিয়েছিল রাজাকারে। তাদের কমান্ডারের নাম ছিল সিদ্দিক কমান্ডার। সিদ্দিক কমান্ডার ঠান্ডা মাথায় মানুষ জবেহ্ করত। এবং বলত— মানুষ জবেহ্ করার সময় খবরদার কেউ বিসমিল্লাহ্ বলবা না। শুধু বলবা আল্লাহু আকবার। যুদ্ধে যাবার সময়ও বিসমিল্লাহ্ বলে যাওয়া যায় না। তখনো বলতে হয় আল্লাহু আকবার। আবার ওষুধ খাওয়ার সময়ও বিসমিল্লাহ বলা যাবে না। বলতে হবে আল্লাহু শাফি। বুঝেছ সবাই ? বুঝতে পারলে বুলন্দ আওয়াজে বলো, ইয়েস কমান্ডার।

তারা সবাই উঁচু গলায় বলত, ইয়েস কমান্ডার।

হামিদ যে রাজাকার দলে ছিল এটা তার অঞ্চলের কেউ জানে না। সংগ্রামের সময় সে ধানকাটার কাজ নিয়ে সিলেটের হাওর অঞ্চলে ছিল। সংগ্রাম শুরু হবার পর গাড়ি নৌকা সব বন্ধ। সে আটকা পড়ে। হাতে নাই পয়সা। মুক্তিতে যাওয়া যায়, কিন্তু মুক্তিতে টাকাপয়সা নাই। রাজাকারে গেলে সত্তর টাকা বেতন। লুটপাটের ভাগও আছে। এছাড়াও অন্য সুবিধা আছে। মিলিটারি এক অফিসার একবার ক্যাম্প দেখতে এসে তাদেরকে দুই বোতল বিলাতি দিলেন। আহা কী জিনিস! স্যার ছিলেন লঞ্চে। তিনি বললেন, অল্পবয়সি দু'টা মেয়েছেলে লাগবে। নানান ঝামেলা করে দু'জন জোগাড় হলো। তারা স্যারের কাছে নিয়ে গেল। স্যার বললেন, আমার জন্যে তো চাই নাই। তোমাদের জন্যে চেয়েছি। তোমরা ফুর্তি কর। শুধু কাজ করলে হয় না। কাজের সাথে ফুর্তিও লাগে। বোতল খাও, বোতল নিয়া ফুর্তি কর। খাঁটি পাকিস্তানিদের জন্যে উপহার।

তারা দু'জনকে নিয়ে ফুর্তি করতে পারে নাই। একজন কীভাবে যেন পালিয়ে গেল, অন্যটা পালাতে পারল না। তার নাম ছিল রাধা। চেহারা ভালো ছিল, তবে তেজ ছিল। আটদিন ছিল। আটদিনে কিছুই খায় নাই। এক ফোঁটা পানিও মুখে দেয় নাই। মেয়েটার ওপর হামিদের খানিকটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। সে অনেকবারই পানি খাওয়াতে চেষ্টা করেছে। যতবারই গেছে ততবারই বজ্জাত মেয়ে তার মুখে থুথু দিয়েছে। আসল হারামি। আদরের মর্যাদা বোঝে না।

দেশ স্বাধীনের পর সে একজোড়া বুটজুতা, খাকি শার্ট এবং প্যান্ট নিয়ে গ্রামে ফিরেছে। এবং মিনমিনে গলায় বলেছে মুক্তিতে নাম লিখায়েছিলাম। যুদ্ধে জীবন গেছে। জান নিয়া ফিরতে পারব ভাবি নাই। সবই আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা।

গ্রামের মানুষ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তাকে যথেষ্টই সম্মান দিয়েছে। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব তাকে একদিন স্কুলে নিয়ে গেলেন। এবং বললেন, তুমি তোমার অভিজ্ঞতার গল্প এদের বলো। এরা শিখবে। দেশমাতৃকার মূল্য কী বুঝবে।

হামিদ বিড়বিড় করে বলল, এইসব পুলাপানের বিষয় না।

=========================================

হেড স্যার বললেন, এরা যুদ্ধের মধ্যে বড় হয়েছে। সবই এদের বিষয়। এদের জানা দরকার।

হামিদ গলা খাঁকারি দিয়ে যুদ্ধের গল্প শুরু করল। কীভাবে তারা একটা লঞ্চ অ্যাটাক করে সাতজন মিলিটারি মারল এবং একটা হিন্দু মেয়ে উদ্ধার করল। যদিও সে শেষ পর্যন্ত বাঁচে নাই।

হেড স্যার বললেন, নাম কী ছিল মেয়েটার ?

হামিদ চাপা গলায় বলল, রাধা।

হেড স্যার বললেন, আহারে! সবাই উঠে দাঁড়াও, রাধা মেয়েটার জন্যে এক মিনিট নীরবতা।

সবাই উঠে দাঁড়াল। হেড স্যার বললেন, গলা ফাটায়ে বলো জয় বাংলা। গলা চিরে যেন রক্ত পড়ে।

জয় বাংলা!

হামিদ যুদ্ধের গল্প বলা বন্ধ করে দিয়েছে অনেকদিন। সে গল্প সেইভাবে বানাতেও পারে না। কী বলতে গিয়ে কী বলবে এটা নিয়ে ভয়ও থাকে। একবার তো প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিল। পত্রিকা থেকে এক লোক এসেছে ছবি তুলবে, ইন্টারভিউ নিবে।

ভাই, আপনি কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন ? আপনার সেক্টর কমান্ডারের নাম কী ?

হামিদ থতমত খেয়ে বলল, লেখাপড়া জানি না তো ভাইসাহেব, কিছু ইয়াদও নাই। একবার মিলিটারির হাতে ধরা খাইলাম। তারা পায়ে দড়ি বাইন্ধা কাঁঠাল গাছে ঝুলায়া রাখল তিনদিন। তখনই মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। কিচ্ছু মনে নাই।

যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তাদের নামও মনে নেই ?

জে না। কিচ্ছুই ইয়াদ নাই। আমি আর কোনো কথা বলব না ভাইজান। কথা বললেই মাথায় যন্ত্রণা হয়।

এখন কিছুদিন হামিদের সত্যি সত্যি মাথার যন্ত্রণা হয়। মাথার যন্ত্রণা খুব বাড়লে সে চলে যায় কুয়াতলায়। কুয়াতলাটা পাকা। হুইল চেয়ার নিয়ে ঘুরতে আরাম। তাছাড়া বিশাল দু'টা জামগাছ আছে। কুয়াতলা ছায়া হয়ে থাকে। গরমের সময় পাকা জাম টুপটাপ করে গায়ে পড়ে। গায়ে পড়া পাকা জামের স্বাদই আলাদা। কুয়াতলার একদিকে ঘুরে হামিদ, তার ঠিক অন্যদিকে ঘুরে তার নাতনি সুধা। সুধার বয়স আড়াই বছর। ফর্সা। গোলগাল মুখ। সুধার মা সবসময় সুধার চোখে

=====================================

কাজল এবং কপালে টিপ দিয়ে রাখে। যেন কেউ নজর দিতে না পারে।

সুধা আপন মনে রান্নাবাটি খেলে। বিড়বিড় করে হাত নেড়ে কথা বলে। হাসে। শুধু যখন হামিদ ডাকে, 'এ্যাই এ্যাই কাছে আয়'— তখন সুধার চোখমুখ শক্ত হয়ে যায়। হামিদ যখন হুইল চেয়ার নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যায় তখন সে চট করে উঠে দাঁড়ায় এবং হামিদের দিকে 'থু' করে থুথু দেয়ার ভঙ্গি করে।

এর কারণটা কী ? দাদার সাথে এ-কী ব্যবহার ? হামিদ ইচ্ছা করলেই ছেলেকে ঘটনাটা বলতে পারে। মেয়ে তার বাবার হাতে কয়েকটা চড় খেলেই সহবত শিখবে। তবে হামিদ এখনো ছেলেকে কিছু বলে নি। ঘটনার কারণ বের করা দরকার। কারণ নিশ্চয়ই আছে।

এক দুপুরে হুইল চেয়ারে হামিদ বসা। হামিদের উল্টাদিকে সুধা খেলছে। দু'জনের মাঝখানে কুয়া বলে তাকে দেখা যাচ্ছে না, তবে তার গলা শোনা যাচ্ছে। কী একটা ছড়া বলছে,

ও কুটকুট কই যাস ?
ভাত নাই পান্তা খাস
পান্তায় আছে শিং মাছ
সইয়ের বাড়িত বড়ই গাছ।

হামিদ ডাকল, সুধা। ও সুধা।

সুধা বলল, চুপ।

হামিদ হুইল চেয়ার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চাকার ঘরঘর শব্দ হচ্ছে। সুধা বলল, কাছে আসবি না, ছেপ দিমু।

হামিদ বলল, ছেপ কেন দিবা দাদু ?

তুই পচা।

হামিদ থমকে গেল। মেয়েটার কথাবার্তা এরকম কেন ? সে কি কিছু জানে ? পুলাপানরা অনেক সময় অনেক কিছু জানে। ক্যামনে জানে বলা কঠিন। মেয়েটা আর কাউরে থুথু দেয় না। তাকে দেখলেই থুথু দেয়। রাধাও থুথু দিত। রাধার মুখও ছিল গোল। দুইজনের নামেরও মিল আছে। একজন রাধা আরেকজন সুধা। হামিদ সাবধানে হুইল চেয়ার নিয়ে এগুচ্ছে, এত সাবধানে যেন কোনো শব্দ পর্যন্ত না হয়।

সুধা দাদাকে দেখে চমকে তাকাল। হামিদ বলল, দাদু, জাম খাইবা ?

সুধা মুখ ভেংচি দিল। জিহ্বা বের করে সাপের মতো নাড়ছে। বদ মেয়ের এত বড় জিহ্বা ? কেঁচি দিয়ে কচ করে জিহ্বাটা কেটে ফেললে মনটা শান্ত হতো।

==========================================

সেটা সম্ভব না। আদরের নাতনি। মেয়েটার বিষয়ে তার বাবা-মাকে বলা দরকার। শাসন করার দায়িত্ব বাবা-মা'র। দাদা-দাদির শাসন বাবা-মা নিতে পারে না।

রাতে খাবার সময় হামিদ বলল, বৌমা, মেয়েটারে একটু শাসন করা দরকার।

হামিদের ছেলের বউ মর্জিনা অবাক হয়ে বলল, আব্বাজান, শাসন করব কেন? এমন লক্ষ্মী মেয়ে। সারাদিন নিজের মনে খেলে।

হামিদ বলল, কিছু কিছু বাজে অভ্যাস হয়েছে। ছেপ দেয়। আবার মুখ ভেংচি দেয়।

কারে ছেপ দেয়?

আমারে।

বলেন কী! ঐ সুধা, সুধা। কাছে আয় দেখি। তুই দাদুরে ছেপ দেস?

হামিদ তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে। কী জবাব দেয় শোনা দরকার। সুধা অবাক হয়ে একবার তার দাদার দিকে একবার তার মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, না মা।

এমনভাবে বলেছে যে বিশ্বাস না করে উপায় নাই। বদ মেয়ে।

মর্জিনা বলল, আব্বাজান, আপনে মনে হয় ধান্দা দেখছেন। বয়সকালে মানুষ ধান্দা দেখে। সুধা মা, যাও দাদুরে আদর দেও। যাও।

হামিদ বিরক্ত মুখে বলল, আদর লাগবে না।

মর্জিনা বলল, অবশ্যই লাগবে। মা যাও। দাদুরে আদর দাও।

সুধা এগিয়ে গেল এবং থু করে থুথু ফেলল। হামিদ বলল, দেখলা কী করেছে?

মর্জিনা অবাক হয়ে বলল, কী করেছে?

ছেপ দিয়েছে দেখ নাই?

মর্জিনা বলল, ছেপ দেয় নাই। আপনি ভুল দেখছেন।

হামিদ নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। এরা কিছু বুঝতে পারছে না। রাধা যেভাবে থুথু দিত এই মেয়েও তাই করে। মেয়েটা দেখতেও রাধার মতো। গোল মুখ। নামেও মিল আছে— রাধা আর সুধা। সুধা নাম রাখা বোকামি হয়েছে। হিন্দুয়ানি নাম।

বয়সকালে মানুষের ঘুম কমে যায়। সারা রাত জেগে কাটাতে হয়। হামিদের হয়েছে উল্টাটা। রাতের ভাত খাওয়ার পর পরই তার ঘুম পায়। এক ঘুমে রাত কাবার। ঘুম আরামের হয় না, এই এক সমস্যা। আলতু-ফালতু স্বপ্ন। বেশির ভাগ

==========================================

স্বপ্নেই সিদ্দিক কমান্ডারকে দেখা যায়। স্বপ্নগুলি এত বাস্তব।

স্বপ্নে সিদ্দিক কমান্ডার এসে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙায়। রাগী গলায় বলে, খবর পাইছি মুক্তি আসছে। আর তুই ঘুমে ? হাতিয়ার কই ? হাতিয়ার নিয়া বাইর হ দেখি। আইজ আমরার খবর আছে।

স্বপ্নের পরের অংশ বড়ই কষ্টকর। ভারি হাতিয়ার কাঁধে নিয়ে বনেজঙ্গলে কাদায়-পানিতে মুক্তির ভয়ে ছোটাছুটি।

মাঝে মাঝে রাধার বিষয়টা স্বপ্নে আসে। একটা গামছায় কোনোমতে শরীর ঢেকে রাধা ঘরের কোনায় বসে আছে। বাস্তবে তার হাত পেছনদিকে বাঁধা থাকত, স্বপ্নে হাত থাকে খোলা। হামিদ ঘরে ঢুকতেই রাধা বলে, আপনারে বাপ ডাকলাম। আপনি আমার ধর্ম বাপ। আমারে দয়া করেন। তখন সিদ্দিক কমান্ডারের কথা শোনা যায়। স্বপ্নে সিদ্দিক কমান্ডার হঠাৎ উদয় হয় এবং চাপা গলায় বলে, সংগ্রামের সময় দয়া মায়া শ্বশুরবাড়িতে বেড়াইতে যায়। বুঝছ রাধা ? আরেকটা কথা, সংগ্রামের সময় বাপ মিলিটারি, আর কেউ বাপ না। আমরারে বাপ ডাইক্যা লাভ নাই। এখন আমরা তোমার স্বামী। এক স্ত্রী সাত স্বামী। একেক স্বামী একেক পদের। প্রত্যেককে সোহাগ করবা। ছেপ যদি দেও পরে বুঝবা।

শেষের দিকে মুক্তিদের অবস্থা ভালো হয়ে গেল। বলতে গেলে রোজ রাত্রেই মুক্তি আসে। একদিন সিদ্দিক কমান্ডার বললেন, আইজ রাতে আমরা পালায়া রাজানগর বাজারে চলে যাব। সেখানে মিলিটারির ঘাঁটি আছে। আমরা নিরাপদে থাকব। সব তৈয়ার থাক। রওনা দিব মাগরেবের ওয়াক্তে।

হামিদ বলল, রাধারে কী করবেন ? ছাইড়া দিবেন, না সাথে নিয়া যাবেন ?

সিদ্দিক বলল, ছাইড়া দিব কোন দুঃখে! এই মেয়ে আমাদের সবেরে চিনে। মুক্তির কাছে খবর দিবে। বুঝেছ ঘটনা ? রাধারে বস্তায় ভইরা হাওরের পানিতে ফেলায়া যেতে হবে। দশ-বারোটা ইট দিবা বস্তার ভিতরে, যেন না ভাসে। আর কাজটা করবা হামিদ।

হামিদ বলল, আমি কী জন্যে করব ?

আমি অর্ডার দিছি এইজন্যে তুমি করবা। কমান্ডারের অর্ডারের উপরে কোনো কথা নাই।

হামিদ কাজটা একা করে নাই। কমান্ডার সিদ্দিক সাহায্য করেছে। মেয়েটারে বস্তায় ভরতে বিরাট ঝামেলা হয়েছিল। সিদ্দিক কমান্ডারের হাত কামড় দিয়া করল রক্তারক্তি কাণ্ড।

==================================================

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই কমান্ডার সিদ্দিক ধরা পড়েছিল মুক্তির হাতে। মুক্তির কমান্ডার তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি সারাজীবনে কোনো ভালো কাজ কী করেছ ? একটা ভালো কাজের কথা বলো।

সিদ্দিক কমান্ডার বলেছে, ভালো কাজ কী করেছি, মন্দ কাজ কী করেছি আপনারে কেন বলব ? এইটা তো রোজহাশর না। তবে আমার সঙ্গে যারা যারা ছিল প্রত্যেকের নাম ঠিকানা দিতেছি, পারলে এদেরও ধরেন। কাগজ-কলম আনেন, নাম লেখেন।

অনেকেই ধরা পড়েছে, হামিদ বাদ পড়েছে। আজ লোকজন তাকে সম্মান করে। ছোট ছোট পুলাপান পতাকা হাতে নিয়ে চিকন গলায় বলে, মুক্তিযোদ্ধা হামিদ জিন্দাবাদ। জীবনটা তার এইভাবে কাটবে সে নিশ্চিত। সমস্যা একটাই, সুধাকে দেখলেই মনে হয় সে সব জানে। রাধা যেভাবে থুথু দিত, সুধা মেয়েটাও সেভাবেই থুথু দেয়। মেয়েটা বড় হবার আগেই একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। সিদ্দিক কমান্ডার বলতেন— যা ইচ্ছা করবা। প্রমাণ রাখবা না। হামিদ নিজেও কোনো প্রমাণ রাখতে চায় না। প্রমাণ খারাপ জিনিস। তার নাতনি সুধা প্রমাণ ছাড়া কিছু না।

এক দুপুরে অস্বাভাবিক গরম পড়েছে। কুয়াতলায় হামিদ হুইল চেয়ারে বসে আছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই। কুয়ার অন্যপাশে সুধা খেলছে। কুটুর কুটুর পুটুর পুটুর করে নিজের মনে কথা বলছে। হামিদ হুইল চেয়ার নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তাকে দেখেই সুধা খেলা বন্ধ করে থু করে একদলা থুথু ফেলল। হামিদ হাত বাড়িয়ে সুধাকে ধরল। পরের ঘটনাগুলি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। কুয়াতে ঝপাং করে ভারি কিছু পড়ার শব্দ হলো। হামিদ এক দুই তিন করে একশ' পর্যন্ত গুনল। কুয়ার ভেতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না। হামিদ তখন আকাশফাটা চিৎকার দিল, বৌমা কই ? বৌমা কই ? আমার দাদু কুয়াতে পড়ে গেছে। বৌমা, ও বৌমা...।

==========================================



## ফোর্টি নাইন

অর্থপেডিক সার্জন মাসুম রহমান অবাক হয়ে রোগীর দিকে তাকিয়ে আছেন। রোগীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চুলে পাক ধরেছে। ছোটখাটো মানুষ। চাপা নাক। বালক বালক চেহারা। রোগীর অস্থির আচরণ, ক্রমাগত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কপালে ঘাম নেই, কিন্তু একটু পরপরই কপালের ঘাম মোছার ভঙ্গি করছে। গলা খাঁকারি দিচ্ছে।

মাসুম রহমান বললেন, আপনার সমস্যাটা আরেকবার বলুন তো।

রোগী টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি।

ছোট হয়ে যাচ্ছেন ?

জি স্যার। যে হারে ছোট হচ্ছি তাতে আঠার বছর ছ'মাস পর আমার উচ্চতা হবে এক ফুট দেড় ইঞ্চি।

আপনার নাম ?

আসাদুজ্জামান চৌধুরী।

কী করেন ?

স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। ক্রমাগত ছোট হচ্ছি— এই টেনশনের কারণে ছাত্র পড়াতে পারছি না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ঘরে বসে আছি।

বিয়ে করেছেন ?

জি। স্ত্রী পাঁচ বছর আগে গত হয়েছেন। একটাই মেয়ে। মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি। জামাই পল্লী বিদ্যুতে কাজ করে।

ছোট হতে শুরু করলেন কবে ?

স্ত্রী-বিয়োগের পর। খুব শক পেয়েছিলাম। দুইদিন এক রাত না খেয়ে ছিলাম। আমার মনে হয় সেই শকে বডি সিস্টেমের কোনো গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

চা খাবেন ?

==========================================

স্যার, আমি চা খাই না। তবে আপনি যখন বলছেন তখন খাব। স্যার কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন ?

না।

বিশ্বাস না করারই কথা। আমি মেডিসিনের এক প্রফেসরকে দেখিয়েছিলাম। উনি সরাসরি বলেছেন— আপনার মানসিক সমস্যা। কোনো একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখান।

সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছিলেন ?

জি-না। আমার কাছে মনে হয়েছে, কোনো একজন অর্থপেডিক ডাক্তার দেখানো ভালো। তিনি হাড় পরীক্ষা করে সহজেই ধরতে পারবেন সমস্যাটা কী। একজন মানুষ ছোট হতে হলে তার হাড় ছোট হতে হবে। লজিক তাই বলে। একজন অর্থপেডিক চিকিৎসক ব্যাপারটা সহজে ধরবেন।

মাসুম রহমান বেল টিপে চা দিতে বললেন। এই রোগী আজকের শেষ রোগী। ঘড়িতে বাজে ন'টা। বাড়ি ফিরে রিলাক্স করার সময়। আজ রাতে রেস্টুরেন্টে খাবার পরিকল্পনা ছিল। তার স্ত্রী হেনা টেলিফোন করে পরিকল্পনা বাতিল করেছে। তুমুল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়বৃষ্টিতে বাইরে যেতে তার ইচ্ছা করছে না। ঘরেই বাদলা দিনের খাবার তৈরি হচ্ছে। ভুনা খিচুড়ি, ইলিশ মাছের ডিম, গরুর মাংস।

চা চলে এসেছে।

আসাদুজ্জামান চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, স্যার, আমি যে ছোট হচ্ছি তার প্রমাণ সঙ্গে করে এনেছি। আপনি অনুমতি দিলে প্রমাণগুলি দেখাই।

কী প্রমাণ এনেছেন ?

পাসপোর্ট নিয়ে এসেছি। পাসপোর্টে যে হাইট দেয়া এখনকার হাইট তারচেয়ে সাত পয়েন্ট দুই ইঞ্চি কম। স্যার, পাসপোর্টটা দেখাব ?

না। পাসপোর্ট ছাড়া আর কী প্রমাণ আছে ?

স্ত্রী-বিয়োগের সময়ের একটা প্যান্ট আর এখনকার একটা প্যান্ট নিয়ে এসেছি। পাশাপাশি ধরলেই বুঝবেন। মেলে ধরব স্যার ?

দরকার নেই।

কাগজপত্রও সঙ্গে আছে। একবার শুধু যদি চোখ বুলাতেন! আপনার সময় নষ্ট করছি বুঝতে পারছি। আমি বিরাট সমস্যায় আছি। স্যার, কাগজপত্র দেখাব ?

কী কাগজপত্র ?

একটা চার্ট। আমি নিজেই গ্রাফের মতো করেছি। x অক্ষে হাইট, y অক্ষে বয়স। প্রায় সরলরেখা রিলেশনশিপ।

==============================================

আপনি স্কুলে কী পড়াতেন ? অংক ?

জি স্যার। আমি B. Sc. টিচার। অংক আর সায়েন্স পড়াই। B. Sc.-তে উপরের দিকে সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিলাম। M. Sc. পড়ার শখ ছিল। আর্থিক সংগতি ছিল না। চার্টটা কি দেখাব ?

না।

আসাদুজ্জামান চা শেষ করেছেন। তিনি বললেন, আপনি অনুমতি দিলে একটা পান খাব স্যার। পান সঙ্গেই আছে। আগে পান খাবার অভ্যাস ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পান খাওয়া ধরেছি। উনার একটা স্মৃতি ধরে রাখা। আমার স্ত্রীর জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। স্যার, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ? Just one humble request.

কী রিকোয়েস্ট ?

কাউকে দিয়ে আমার হাইটটা মাপাবেন। দু'বছর পর মিলিয়ে দেখবেন।

মাসুম রহমান তার সহকারীকে ডেকে রোগীর হাইট মাপতে বললেন।

আসাদুজ্জামান বললেন, একটা কাগজে এই হাইটটা লিখে নামটা সিগনেচার করে রাখুন। আর আমার কাছে দিন। আমি যত্ন করে রাখব। আপনি হারিয়ে ফেলবেন।

মাসুম রহমান বললেন, আমার কাছেই রেকর্ডটা থাকবে। আমি হারাব না।

দুই বছর অনেক সময় স্যার।

যত সময়ই হোক, আপনার হাইট লেখা কাগজটা আমার কাছে থাকবে। আর যদি হারিয়েও ফেলি হাইট মনে থাকবে। চার ফুট নয় ইঞ্চি। অর্থাৎ ফোর্টি নাইন। হাফ সেঞ্চুরির এক কম। ভাই, এখন যান। আপনি আমার অনেক সময় নষ্ট করছেন।

এই পৃথিবীতে আমি একাই ছোট হচ্ছি, নাকি আরো অনেকে হচ্ছে, আমার জানার ইচ্ছা। টাকা থাকলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতাম। বিজ্ঞাপনে লিখতাম, যাদের হাইট ক্রমাগত কমছে তারা যোগাযোগ করুন।

ভাই, আমি এখন উঠব।

আসাদুজ্জামানও উঠলেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠলেন।

সিন্দাবাদের ভূতের প্রতীকী অর্থ আছে। অনেক সমস্যাই সিন্দাবাদের ভূতের মতো মানুষের ঘাড়ে চেপে থাকে। কিছুতেই সেই ভূত ঘাড় থেকে নামানো যায় না। আসাদুজ্জামান নামের মানুষটা মাসুম রহমানের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতোই চেপে বসল। কিছুদিন পর পর টেলিফোন। মাসে একবার চিঠি। একটা চিঠির নমুনা—

==========================================

জনাব অধ্যাপক মাসুম রহমান,

আসসালাম। আমি আসাদুজ্জামান চৌধুরী। শিবচর হাইস্কুলের প্রাক্তন অংক শিক্ষক। আশা করি আপনি আমাকে স্মরণে রেখেছেন। আমার উচ্চতাও আপনার মনে আছে— চার ফুট নয় ইঞ্চি। ফোর্টি নাইন। হাফ সেঞ্চুরির এক কম। এই তথ্য যেন ভুলে না যান সেই কারণেই পত্র দিলাম। একই সঙ্গে পাসপোর্ট সাইজ একটা ছবিও দিলাম। যখন আপনার সঙ্গে আবার দেখা করব তখন যদি চিনতে না পারেন, এই জন্যেই ছবি। বড়দের সালাম এবং ছোটদের শ্রেণীমতো দোয়া এবং স্নেহাশীষ দিবেন।

ইতি
আসাদুজ্জামান চৌধুরী
(ফোর্টি নাইন)

সমস্যা এখানেই শেষ না। মাসুম রহমান তাঁর জন্মদিনে ফুলের তোড়া এবং কার্ড পাওয়াও শুরু করলেন। আসাদুজ্জামান অফিস থেকে তাঁর জন্মদিনের তারিখ জেনেছে। কার্ডে লেখা থাকে—

জন্মদিনের ফুলেল শুভেচ্ছা
ফোর্টি নাইন আসাদুজ্জামান

রোগী দেখার সময়ও প্রায়ই আসাদুজ্জামানকে দেখা যায়। রোগীদের সঙ্গে গুটিসুটি মেরে বসে পান খাচ্ছে। তবে দেখা করতে আসে না। ঘণ্টা দুই-তিন বসে থেকে চলে যায়। সে দূরে বসে থেকেও এমন একটা চাপ তৈরি করে যার ব্যাখ্যা চলে না। একজন মানসিক রোগী আশেপাশে আছে, তাকে লক্ষ রাখছে, ভাবতেই কেমন যেন লাগে।

দ্বিতীয় বছরে মাসুম রহমান রোগীর হাত থেকে বিশেষ উপায়ে মুক্তি পেলেন। সৌদি আরবে কিং ফয়সল হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। চাকরির তৃতীয় বছরে হঠাৎ কুরিয়ারে আসাদুজ্জামানের চিঠি।

স্যার,

আসসালাম। অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানা জোগাড় করেছি। আপনার সঙ্গে সর্বশেষ দেখা হবার পর আমি আরো দ্রুততার সঙ্গে ছোট হতে শুরু করেছি। এখন আমাকে পিগমি মানবের মতো দেখায়। সঙ্গে ছবি পাঠালাম। বর্তমানের ছবি এবং পূর্বের ছবি। হাইট চার্ট জিরক্স করে পাঠালাম। এখন আমার কী করণীয়?

==========================================

বিষয়টির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া উচিত। এমনও তো হতে পারে— আমার ব্যাধি জীবাণু কিংবা ভাইরাসঘটিত। এক মানবদেহ থেকে আরেক মানবদেহে সংক্রামিত হওয়ার মতো।

যদি তাই হয় তাহলে এই ভয়াবহ ব্যাধি রোধ কল্পে ব্যাপক গবেষণা হওয়া উচিত।

প্লেগ সংক্রমণের সময় বিশ্বের বিশাল মানবগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়েছিল। সেরকম পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে দেখা যাবে মানবজাতি এক-দেড় ইঞ্চি সাইজে পরিণত হয়েছে। অবশ্য তার একটা সুবিধাও আছে— খাদ্যাভাব পুরোপুরি দূর হবে।

বিশাল দালানকোঠার প্রয়োজন হবে না। ম্যাচবক্সের সাইজের বাড়িঘরেই চলবে। নভোযানে চড়ে চন্দ্র এবং মঙ্গল গ্রহের অভিযান তেমন ব্যয়বহুল হবে না। কারণ নভোযানের সাইজ হবে ছোট।

সমাজ বিজ্ঞানীদের উচিত বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করা।

স্যার, আপনার প্রতি আমার একটি বিশেষ অনুরোধ— নিজের উচ্চতার প্রতি লক্ষ রাখবেন। আপনার সঙ্গে আমার নানানভাবে যোগাযোগ হয়েছে। খাটো হওয়া বিষয়টা ভাইরাসঘটিত হলে আপনার কিঞ্চিৎ আশঙ্কা আছে।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য
ফোর্টি নাইন আসাদুজ্জামান

মাসুম রহমান সব কাগজপত্র ডাস্টবিনে ফেলে তিনবার বললেন, গাধা, গাধা, গাধা।

কী কুক্ষণেই না এই লোকের কথা মন দিয়ে শুনেছিলেন। তার উচিত ছিল প্রথম দিনেই তাকে কানে ধরে চেম্বার থেকে বের করে দেয়া। বদের বাচ্চা!

কিং ফয়সল হাসপাতালের চাকরি শেষ করে তিনি কানাডার একটা হাসপাতালে যোগ দিলেন। বেশকিছু বছর পার হলো। এর মধ্যে ফোর্টি নাইন আসাদুজ্জামান আর যোগাযোগ করল না। সম্ভবত ঠিকানা বের করতে পারে নি।

জানুয়ারি মাসের এক রাতের কথা। বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। ব্লিজার্ড হতে পারে এমন ঘোষণা আবহাওয়া অফিস দিয়েছে।

==========================================

মাসুম রহমান স্ত্রীকে পাশে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসেছেন। তাঁর হাতে বিয়ারের ক্যান। নিজেকে সুখী সুখী লাগছে। সুখী ভাবারই কথা। দু'টি মেয়েরই ভালো বিয়ে দিয়েছেন। শেষ বয়সের জন্যে আলাদা করে রাখা সঞ্চয়ের পরিমাণও যথেষ্টই ভালো। স্ত্রী-ভাগ্যেও তিনি ভাগ্যবান। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে এমন মনে করতে পারলেন না।

হেনা বলল, তোমাকে একটা কথা বলব ?

মাসুম রহমান বললেন, কথা বলার অনুমতি লাগে না-কি!

অস্বস্তি বোধ করছি বলেই বলছি। অনেকদিন থেকেই বলতে চাচ্ছি কিন্তু বলতে পারছি না। আমার কেন জানি মনে হয় তুমি shrink করছ।

কী বললে ?

তোমার হাইট কমছে। প্যান্টগুলি সব বড় লাগছে।

মাসুম রহমান বললেন, আসাদুজ্জামানের মতো কথা বলবে না।

হেনা বলল, আসাদুজ্জামানটা কে ?

মাসুম রহমান বললেন, তোমার মতো একজন মূর্খ।

হঠাৎ রেগে গেলে কেন ?

মূর্খের মতো কথা বললে রাগব না ?

হেনা শান্ত গলায় বলল, আমি মোটেই মূর্খের মতো কথা বলছি না। তুমি যে shrink করছ এটা তুমি নিজেও জানো। তুমি সব জুতা ফেলে নতুন জুতা কিনছ। নতুন প্যান্ট কিনছ। আগের গুলি নিজে ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছ।

মানুষ নতুন জুতা প্যান্ট কিনতে পারে না ?

হেনা বলল, বাথরুমে ওজন মাপার যন্ত্র থাকে। হাইট মাপার কিছু থাকে না। তুমি গতমাসে হাইট মাপার যন্ত্র কিনে বাথরুমে রেখেছ।

মাসুম রহমান বললেন, শাট আপ ইউ বিচ।

রাগে মাসুম রহমানের হাত-পা কাঁপছে। বিয়ারের ক্যান স্ত্রীর মুখের উপর ছুড়ে মারতে ইচ্ছা করছে।

বাইরে ব্লিজার্ড শুরু হয়েছে। ঝড়ের প্রচণ্ড মাতামাতি।

হেনা বলল, আমি প্রতিদিন তোমাকে দেখছি বলে ধরতে পারছি না। তুমি কতটুকু খাটো হয়েছ বলবে ? এটা কি কোনো নতুন রোগ ? এর কি কোনো চিকিৎসা আছে ?

মাসুম রহমান মুখ বিকৃত করে F অক্ষর দিয়ে কুৎসিত একটা ইংরেজি গালি দিলেন। তাঁর হাইট ছিল পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। এখন হয়েছে চার ফুট নয় ইঞ্চি। ফোর্টি নাইন।

====================================



# সগিরন বুয়া

সগিরন ধানমণ্ডি তিন নম্বর রোডের একটা ফ্ল্যাটে কাজ পেয়েছে। বাচ্চা রাখার কাজ। বাচ্চার বয়স তের মাস। নাম টুলটুল। টুলটুল হাঁটতে পারে। অনেক কথা বলতে পারে। যেমন দুদু, মা, বাবা, পিপি। টিভিতে গানের যে-কোনো অনুষ্ঠান হলেই সে হাত নাড়ে, শরীর দোলায়।

টুলটুলের মা'র নাম রেশমী। পুতুলের মতো দেখতে একজন মহিলা। তিনি এবং তার স্বামী দু'জনই অফিসে কাজ করেন। সগিরনের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা দু'জন যখন থাকেন না তখন টুলটুলের দেখাশোনা করা। সগিরন ভোর আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করে নিজের বাসায় চলে যেতে পারবে।

তোমাকে মাসে পনেরো শ' টাকা দিব। চলবে ?

সগিরনের বুকে ধাক্কার মতো লাগল। এতগুলি টাকা ? সে বিড়বিড় করে বলল, চলবে আম্মা।

আমাকে আম্মা বলবে না। আপা বলবে। আর টুলটুলের বাবাকে স্যার বলবে।

জি আচ্ছা।

বাসায় একজন বাবুর্চি থাকবে, একজন পিওন থাকবে। ওদের দু'জনের কাছে মোবাইল ফোন আছে। বাবুর কোনো সমস্যা হলেই ওদেরকে বলবে। ওরা আমাকে জানাবে।

জি আচ্ছা।

বাবু যদি কোনো কাচের জিনিস, ফুলদানি এইসব ধরতে যায় তাহলে বলবে, নো, নো, নো। তিনবার নো বললেই আর ধরবে না। বুঝেছ ?

জি।

বাবু যখন বলবে নি নি তার মানে সে পানি খেতে চায়। বাবুর পানি আলাদা আছে। বাবুর্চিকে বললেই দিবে।

===============================================

জি আচ্ছা।

সকালে কাজ করতে এসে প্রথমেই বাথরুমে ঢুকবে। সেখানে তোমার জন্যে ধোয়া শাড়ি, সায়া ব্লাউজ সব থাকবে। তুমি ভালো করে সাবান দিয়ে গোসল করে দাঁত মাজবে, তারপর নতুন শাড়ি পরে এসে বাবুকে ধরবে। কাজ শেষ করে যাবার সময় এখানকার কাপড় রেখে যাবে। ঠিক আছে ?

জি।

তোমার হাতের নখ কি কাটা আছে ? নখ দেখি। নখ কাটাই আছে। আচ্ছা যাও, কাজে লেগে যাও। বাথরুমে ঢুকে পড়। টুথপেস্ট ব্রাস সবই আছে। একটা শ্যাম্পুও আছে। চুলে শ্যাম্পু দিও। নয়তো মাথায় উকুন হবে। সেই উকুন বাবুর মাথায় যাবে। বুঝেছ ?

জি।

এখন এই দু'টা ট্যাবলেট পানি দিয়ে গিলে ফেল। কৃমির ট্যাবলেট। বস্তিতে যারা থাকে তাদের সবার পেটভর্তি কৃমি। তুমি বস্তিতে থাক না ?

জি।

স্বামী আছে ?

আছে।

স্বামী কী করে ?

রিকশা চালাইত, এখন পায়ে দুঃখু পাইছে। ঘরে বসা।

ছেলেমেয়ে আছে ?

জে-না।

যে বস্তিতে থাক তার ঠিকানা লিখে পিওনের কাছে দাও।

আপা, লেখাপড়া জানি না।

পিওনকে ঠিকানা বলো সে লিখে নিবে।

জি আচ্ছা।

টুলটুলের বাবা সিগারেট খায়। সে যখন সিগারেট ধরাবে তখন বাবুকে তার ধারেকাছে নেবে না। মনে থাকবে ?

থাকবে।

প্রথমদিন কাজ শেষ করে সগিরন বস্তিতে ফিরল। সগিরনের স্বামী জয়নাল বলল, কাজ পাইছ, শুকুর আলহামদুল্লিাহ্। কী কাজ কী সমাচার বলো শুনি।

সগিরন আগ্রহ নিয়ে গল্প করছে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে জয়নাল।

বাচ্চাটা কী যে সুন্দর! আমি আমার জন্মে এমন সুন্দর বাচ্চা দেখি নাই। আমারে বাদ দেও, কেউ দেখে নাই। কী সুন্দর হাসি। যখন হাসে কইলজার মধ্যে মোচড় দেয়।

কান্দে না ?

কদাচিৎ। এইটুক বাচ্চা, কী যে বুদ্ধি!

জয়নাল বলল, মাশাল্লা বলো। সবসময় মাশাল্লা বলবা।

সগিরন বলল, মাশাল্লা। তার বুদ্ধির নমুনা শুনবেন ? টেবিলের উপরে একটা পানির গ্লাস। বাবু দৌড় দিছে গ্লাস ধরবে। আমি বললাম, নো নো নো। বলার সাথে সাথে সে দাঁড়ায়া গেল। আমার দিকে চায়া এমন একটা হাসি দিল যে কইলজা পুইড়া গেল। আমার নিজের এমন একটা পুলা থাকলে বলতাম, যাও বাবা গ্লাস ধর। ইচ্ছা করলে ভাইঙা চাইর টুকরা কর, কিছু বলব না।

সগিরনের চোখে পানি এসে গেছে। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। জয়নাল বলল, তুমি তো বাচ্চাটারে চউখ লাগায়া দিবা। বেশি স্নেহ পড়লেই চউখ লাগে। অজু কইরা দুই রাকাত নফল নামাজ পইড়া আল্লাপাকরে বলো যেন চউখ না লাগে।

সগিরন নামাজ পড়তে উঠে গেল।

টুলটুলদের বাড়িতে সগিরনের কাজের পনেরো দিনের মতো হয়েছে। এই পনেরো দিনে টুলটুল সগিরনকে ভালোমতো চিনেছে। সগিরন যদি ডাকে, বাবু কই গো!

টুলটুল সঙ্গে সঙ্গে বলে সগি। সগি মানে সগিরন। বলেই সে দু'হাত বাড়িয়ে বলে 'কুলা'। কুলার অর্থ টুলটুল কোলে উঠতে চাচ্ছে। তাকে কোলে নেয়াতে বিপদ আছে। সে কথা নেই বার্তা নেই কুট করে সগিরনের ঘাড়ে কামড় দিবে। সগিরন ব্যথা পেলেও কিছু বলে না। বেচারার দাঁত শিরশির করে। না কামড়িয়ে কী করবে!

সগিরন প্রতিদিনই নতুন নতুন গল্প স্বামীর জন্যে নিয়ে আসে। সেইসব গল্প শুনতে জয়নালের বড় ভালো লাগে। টুলটুলকে দেখতে ইচ্ছা করে। সগিরনের পক্ষে সম্ভব না বাচ্চাটাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসে। তার পক্ষেও সেই বাড়িতে যাওয়া সম্ভব না। এক্সিডেন্টে তার বাম পা কাটা পড়ায় সে ঘরেই বন্দি। ক্র্যাচ একটা আছে। বগলে ক্র্যাচ লাগিয়ে হাঁটতে বের হওয়া তার কাছে ঘৃণাকর। যে একদিন বাতাসের আগে রিকশা চালিয়েছে, সে ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটবে। ছিঃ ছিঃ।

রাতে ভাত খেতে বসে সগিরন বলল, আইজ কী হইছে শুনেন। বাবুর পিতামাতার মধ্যে বাজি। বাবু পিতামাতার মধ্যে কারে বেশি পছন্দ করে। বাপ-মা দুইজন ঘরের দুই কোনায় দুই সোফায় বসছে। আমি বাবুরে কুলে নিয়া মধ্যিখানে খাড়ায়া আছি। আমি বাবুরে ছাইড়া দিব। বাপ-মা দুইজনেই একত্রে

==========================================================

ডাকব, আয় আয়। বাবু কার দিকে যায় সেই বাজি।

জয়নাল বলল, পুত্রসন্তান তো মা'র কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়বে। এইটাই জগতের নিয়ম।

সগিরন বলল, শুনেন না ঘটনা কী। আমি বাবুরে ছাড়লাম। দুইজনেই একত্রে হাত উঠায়া ডাকতেছে, আয় আয়। বাবু রওনা হইল বাপের দিকে। মায়ের মুখটা কালো হইয়া গেল। বাপের কাছাকাছি গিয়া বাবু তার বাপের দিকে তাকায়ে হাসল, তারপরেই এক দৌড়ে মা'র কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়ল।

জয়নাল তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, বলছিলাম না মা'র কোলে যাবে! কথায় আছে— কিসের মাসি, কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন। মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন। বাজিতে হাইরা টুলটুলের পিতা কী বলল ?

বলল, নটি বয়।

নটি বয় কী ?

আহ্লাদের একটা কথা। স্যারের মনে আহ্লাদ হইলেই স্যার বলেন, নটি বয়।

জয়নাল বলল, বাজি কী ছিল ? টাকাপয়সার বাজি ?

সগিরন বলল, না। চোখের ইশারায় বাজি হইছে, তয় আমি অনুমান করেছি।

কী অনুমান করছ ?

সেটা বলব না, লজ্জার বিষয় আছে।

থাক তাইলে, বলার প্রয়োজন নাই। বাবুর একটা ছবি যদি সম্ভব হয় আনবা। দেখতে ইচ্ছা করে। পরে ফিরত দিও।

আইচ্ছা চেষ্টা নিব।

দুইদিনের ভেতর সগিরন ছবি নিয়ে এল। আনন্দে সে ঝলমল করছে, কারণ এই ছবি তাকে ফেরত দিতে হবে না। সগিরন বলল, বাবুর মা যে কী ভালো এটা আপনের কল্পনার মধ্যেও নাই। আমি যখন বাবুর একটা ছবি চাইলাম আপা বলল, ছবি দিয়ে কী করবে ?

আমি বললাম, আমার স্বামীর তারে খুব দেখার ইচ্ছা। উনারে দেখায়া ছবি ফিরত দিব।

আপা বললেন, এই নাও ছবি, ফিরত দিতে হবে না।

জয়নাল বলল, এইটাই হইল উচ্চ শিক্ষার গুণ। বুঝছ ? তারার শিক্ষা যদি না থাকত তাইলে ছবি দিত না।

সগিরন বলল, অতি সত্য কথা। আপার আরেকটা ঘটনা শুনেন। বাবু করছে কী, তার বাপের সিগারেটের ছাইদানি থাইকা একটা আধখাওয়া সিগারেট নিয়া

==========================================

চাবাইতে শুরু করেছে। আমি যতই বলি, বাবা ফেলো। বাবা ফেলো। বাবু ততই চাবায়। মুখে আঙুল দিয়া বাইর করতে গেছি, বাবু তখন গিল্লা ফেলল।

জয়নাল বলল, এত বড় একটা ঘটনা তুমি সামনে থাকতে ঘটল ? তোমার চাকরি তো সঙ্গে সঙ্গে নট হওয়া দরকার।

আমি খুবই ভয় পাইলাম। সিগারেট চাবায়া খাইয়া ফেলছে। কী জানি হয় ? আপা বাসায় আসামাত্র বললাম।

আপা বললেন, এই বয়সের বাচ্চারা যা দেখবে তাই মুখে দিবে। মুখে দিতে দিতে শিখবে কোনটা খাবার, কোনটা খাবার না। তোমার এত অস্থির হবার কিছু নেই। তবে আরো সাবধান থাকবে।

জয়নাল বলল, এই বলল ? আর কিছু না। ধমকাধমকিও করল না ?

সগিরন বলল, আরেকটা কথা বলছেন, সেই কথা শুনার পরে দৌড় দিয়া বাথরুমে ঢুইক্যা খুব কাঁদছি।

জয়নাল বলল, কী কথা ?

সগিরন বলল, আপা বললেন, শোন সগিরন। আমি যতক্ষণ বাইরে থাকব ততক্ষণ বাবুর মা তুমি, এটা মনে রাখবে।

জয়নাল বলল, অজুর পানি দাও বউ। এক্ষণ যদি তোমার আপার জন্যে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ না পড়ি তাইলে পাপ হবে।

বাবুর ছবিটা দেখবেন না ?

নামাজ পইড়া তারপর দেখব। ছবিটা বান্দায়া আনার ব্যবস্থা করবা। ঘরে টানায়া রাখব।

জয়নাল নামাজ শেষ করে বাবুর ছবি হাতে বসল। দীর্ঘ সময় ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সালমার চেহারার সাথে কী যেন একটা মিল আছে। ঠিক না বউ ?

সগিরন বলল, নাকটার মধ্যে মিল। চাপা নাক। সালমার নাকও চাপা ছিল।

জয়নাল বলল, ঠিক বলেছ। অবিকল সালমার নাক।

সগিরন বলল, চউখের মধ্যেও একটা মিল আছে। মিলটা ধরতে পারতেছি না।

জয়নাল বলল, সত্য বলেছ। চউখেও মিল আছে।

সালমা জয়নাল-সগিরনের একমাত্র মেয়ে। আজ থেকে তের বছর আগে দারুণ অভাবে পড়ে এক হাজার টাকায় মেয়েটাকে তারা বিক্রি করে দিয়েছিল। তখন সালমার বয়স ছিল তেরো মাস। এই বয়সে সালমাও অনেকগুলি কথা শিখেছিল— বাবা, মা, পানি...

==========================================



# নয়া রিকশা

জাহেদা তার ছেলের নাম রেখেছে— 'জাহেদুর রহমান খান'। মায়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম। ছেলের নামে যদি মায়ের নামের মিল থাকে, তাহলে বেহেশতে মা-ছেলের দেখা হয়। এটা তুচ্ছ করার বিষয় না। লাখ লাখ মানুষ বেহেশতে যাবে। কারণ লাখ লাখ মানুষ উপাসী। বেহেশত উপাসী মানুষদের জন্যে পুরস্কার। মাওলানা সাহেবের নিজের মুখের কথা। লাখ লাখ মানুষের মধ্যে জাহেদা তার ছেলেকে খুঁজে নাও পেতে পারে। মিল দিয়ে নাম রেখে এই সমস্যার একটা সমাধান করে জাহেদা খুশি। জাহেদার স্বামী কুদ্দুসও খুশি। জাহেদুর রহমান খান নামকরণে কুদ্দুসেরও কিঞ্চিৎ ভূমিকা আছে। নামের শেষে 'খান' সে লাগিয়ে দিয়েছে। সে বউকে বলেছে, খান বসার কারণে নামের মধ্যে 'স্পিড' আসছে। আমরা খান বংশ না তো কী? আমার ছেলে খান।

কুদ্দুস ঢাকা শহরে রিকশা চালায়। তার কথাবার্তায় কিছু ইংরেজি শব্দ থাকে। এইসব ইংরেজি সে সিনেমা দেখে শিখে। সিনেমার হিরোরা কথাবার্তায় অনেক ইংরেজি বলেন। নায়ক মান্নাভাই এক ছবিতে হিরোইনকে বললেন, 'চাঁদ শোন, তোমাকে খুব বিউটি লাগছে।' কুদ্দুস সেখান থেকে বিউটি শব্দটা শিখেছে। ছেলের মুখ দেখে সে বলেছে, জাহেদা, তোমার ছেলে বিরাট বিউটি হয়েছে।

জাহেদা বলেছে, নজর লাগায়েন না। পিতামাতার নজর খুব খারাপ। ছেলের মাথাত থুক দেন। তিনবার বলেন, মাশাল্লা।

কুদ্দুস তার ছেলের মুখে একদলা থুথু ফেলে বলল, মাশাল্লা। তিনবার বলার কথা, সে বলল সাতবার।

সাধারণত কন্যাসন্তান সংসারে ভাগ্য নিয়ে আসে। মাওলানা সাহেব এই কথা ওয়াজে বলেছেন। জাহেদার ধারণা তার বেলায় উল্টাটা হয়েছে। ছেলে সংসারে ভাগ্য নিয়ে এসেছে। রিকশা চালিয়ে ছেলের বাবা ভালো টাকাপয়সা আনছে। যা

===========================================

ভাড়া তারচেয়ে অতিরিক্ত টাকা বেশ কয়েকবার পেয়েছে। নিউমার্কেট থেকে ধানমণ্ডি তিন-এর ভাড়া হয় দশ টাকা। সেখানে এক প্যাসেনজার একশ' টাকার একটা নোট বের করে বলল, ভাংতি আছে?

কুদ্দুস বলল, জি-না স্যার।

তোমার সাথে কত আছে দেখ।

কুদ্দুস টাকা গুনে বলল, একাশি টাকা আছে স্যার।

যাত্রী বলল, একাশি টাকা আমাকে দিয়ে একশ' টাকার নোটটা রেখে দাও। কী আর করা।

কুদ্দুস একাশি টাকা প্যাসেনজারকে দিতে গেল। তখন হঠাৎ প্যাসেনজার বলল, থাক টাকা দিতে হবে না। পুরোটাই রেখে দাও।

এইরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ছেলের ভাগ্যেই ঘটছে। কিছুই বলা যায় না, ছেলের ভাগ্যেই হয়তো কুদ্দুসের নিজের রিকশা হবে। মালিকের রিকশা চালিয়ে রোজ পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হবে না। কুদ্দুস ঠিক করে রেখেছে, নিজের রিকশা হলে সে একবেলা রিকশা চালাবে। একবেলা বিশ্রাম। সেই একবেলা সে ছেলেকে খেলা দিবে।

কুদ্দুস সকাল সাতটায় রিকশা নিয়ে বের হয়। ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা-বারোটা হয়। এই দীর্ঘ সময় ছেলেকে না দেখতে পারায় তার বড় অস্থির লাগে। নিজের রিকশা হলে এই অস্থিরতা থাকবে না। তখন তার একবেলা কাটবে প্যাসেনজারের সাথে, একবেলা ছেলের সাথে।

এখনো সে ছেলের সঙ্গে সময় কাটায়। খুবই অল্প সময়। মালিকের কাছে রিকশা জমা দিয়ে সে ঘরে ফিরে গোসল করে। ভাত খেয়ে ঘুমুতে আসে। তখন সে ছেলেকে বুকে নিয়ে গল্প করে। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসে। সে জোর করে জেগে থাকে। বিড়বিড় করে ছেলের সঙ্গে কথা বলে। মাঝে মাঝে ছেলেকে নিয়ে ছড়া বাঁধে—

আমার ছেলে রিকশা বায়
রইদে পুড়ে আগুলিয়া যায়॥

এই ধরনের ছড়ায় জাহেদা রাগ করে। সে কঠিন গলায় বলে, এইগুলা কী বলেন! আপনের ছেলে রিকশা বাইব কোন দুঃখে? হে লেখাপড়া শিখব। ছুলেমান ভাইয়ের ছেলের মতো 'জিপি' পাইব। পত্রিকায় তার ছবি ছাপব।

ছুলেমান বস্তিতে জাহেদার পাশের ঘরেই থাকে। তার ছেলে এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। তার ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পত্রিকাওয়ালারা

==========================================

ছুলেমানকে একটা নতুন রিকশা কিনে দিয়েছে।

জাহেদা নিশ্চিত একদিন তার ছেলে জাহেদুর রহমান খানের ছবিও ছাপা হবে। তারাও নতুন একটা রিকশা পাবে। জাহেদা ঠিক করে রেখেছে, যেদিন নতুন রিকশা পাবে সেদিন সে ছেলেকে নিয়ে প্যাসেনজারের মতো রিকশায় বসে থাকবে। শহর ঘুরে দেখবে। মা-ছেলে মিলে আইসক্রিম কিনে খাবে। সন্ধ্যাবেলা মা-বাবা-বেটায় মিলে ছবি দেখতে যাবে। মান্না ভাইয়ের কোনো ছবি। মান্না ভাইকে জাহেদার খুবই পছন্দ। আহারে, কী পাট গায়! বেশ কয়েকবার সে এফডিসির গেটে দাঁড়িয়ে মান্না ভাইকে দেখেছে। ঠিক দেখা বলা যাবে না। মান্না ভাই দামি গাড়িতে হুট করে ঢুকে গেছেন।

বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, মান্না ভাইয়ের সঙ্গে জাহেদার যোগাযোগের এক ব্যবস্থা হয়ে গেল। এফডিসিতে অভিনয়ের জন্যে বাচ্চা সাপ্লাই দেয় ফরিদা। সে একদিন জাহেদার কাছে উপস্থিত। পানের পিক ফেলতে ফেলতে ফরিদা বলল, তোর পুলার চেহারা ছবি মাশাল্লা ভালো। ফিল্মে পাট গাইতে দিবি ?

জাহেদা বলল, দুধের শিশু, দশদিন বয়স, সে কী পাট গাইব ?

মায়ের পেট কাইটা সন্তান বাইর হইছে এই পাট গাইব। ডায়লগ আছে। ডায়লগ হইছে চিৎকার কইরা কান্দন। এই শিশুই বড় হইয়া হইব হিরু মান্না। রাজি থাকলে ক। পরশু সইন্ধায় শুটিং। ছেলে একবেলা কাজ করব। নগদ পাঁচশ' পাইব।

পাঁচশ' ?

হুঁ। আগে তিনশ' ছিল। এখন বাইরা পাঁচশ' হইছে। তুই আমারে দিবি দুইশ'। তিনশ' নিজের কাছে রাখবি। পুলার রোজগার খাইবি। পুলার রোজগার খাওয়ার মতো আনন্দের আর কিছুই নাই। রোজগার একবার খাইয়া দেখ। কী রাজি ?

হুঁ রাজি।

জাহেদার অতি দ্রুত রাজি হবার পেছনের কারণ ছেলের রোজগার খাওয়া না। তার ছেলে মান্না ভাইয়ের পাট গাইছে এটা অনেক বড় ব্যাপার। তারচেয়েও বড় ব্যাপার— এক মাসের জন্যে একটা টেবিল ফ্যানের ভাড়া তিনশ' টাকা। এই টাকায় সে একটা ফ্যান ভাড়া করতে পারবে। তার ঘরে ইলেকট্রিসিটি আছে। ফ্যান চলবে। ফ্যানের বাতাসে জাহেদুর রহমান খান আরাম করে ঘুমাবে। গরমে বেচারা বড় কষ্ট করছে। হাতপাখা দিয়ে কতক্ষণ আর বাতাস করা যায়!

===================================

তারপরেও জাহেদা প্রায় সারারাতই হাওয়া করে। ঘুমের মধ্যেও তার হাত নড়ে। ফ্যান চললে তার নিজেরও শান্তি।

জাহেদার খুব শখ ছিল শুটিং দেখবে। সেটা সম্ভব হলো না। ফরিদা বলল, ডিরেক্টর বলে দিয়েছে বাচ্চার মা যেন না আসে। সব বাচ্চার মা শুটিংয়ের সময় নখরা করে। বাচ্চার জন্যে অকারণে অস্থির হয়। শুটিং-এ ডিস্টার্ব।

জাহেদা বলল, বাচ্চা না দেইখা আমি ক্যামনে থাকব ?

ফরিদা বলল, আমি কোলে কইরা নিয়া যাব। দুই ঘণ্টা পরে ফিরত দিয়া যাব। তুই খাড়ায়া থাকবি এফডিসির গেটে। ঠিক আছে কি-না বল। ঠিক না থাকলে অন্য বাচ্চা দেখি। শিশুবাচ্চার কোনো অভাব নাই। আরো দুইজনের সাথে কথা হইয়া আছে। এখন বল ঠিক আছে ?

জাহেদা ক্ষীণস্বরে বলল, ঠিক আছে। টেকা কি আইজই পাব ?

ফরিদা বলল, অবশ্যই। বাচ্চা আর টেকা একসঙ্গে পাবি।

কাজ দুই ঘণ্টায় শেষ হইব ?

আরো আগেই শেষ হইব। এই ডাইরেক্টর শিশুবাচ্চার ব্যাপারে খুব সাবধান। বাচ্চা নিয়া উপস্থিত হইলে তিনি সব কাজ ফালাইয়া বাচ্চার শুটিং করেন।

ডাইরেক্টর সাহেবের নাম কী ?

কামাল। হিট ডাইরেক্টর। এখন যে ছবি বানাইতাছেন, তার নাম 'প্রেম দিওয়ানা'। এই ছবিও হিট হইব। তোর ছেলের নাম ফাটব। হলে গিয়া ছেলের ছবি দেখবি।

ডাইরেক্টর কামাল ছোট শিশুর ব্যাপারে যে সাবধানী তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ফরিদার কোলের বাচ্চা দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ নতুন করে হাসপাতালের লাইট করতে বললেন। হাসপাতালের সেট তৈরিই আছে। শুধু লাইট করা।

ডাইরেক্টর কামাল বললেন, ট্রলি শট হবে। এক টেকে OK করতে হবে। নবজাতক শিশু নিয়ে কারবার। আমি দশবার শট নিব না। লেডি ডাক্তার বাচ্চার পায়ে ধরে বাচ্চাকে ফ্রেমে নিয়ে আসবে। বাচ্চা কাঁদছে। বিগ ক্লোজ। সেখান থেকে ক্যামেরা ওয়াইড হবে। সবাইকে যখন একসঙ্গে পাওয়া যাবে তখন বাচ্চার মা বলবে, 'আমার যাদু কই ? আমার যাদু কই ?' বলতে বলতে মায়ের মৃত্যু। শট শেষ। আধঘণ্টা সময়। আধঘণ্টার মধ্যে সব রেডি চাই। ট্রলি বসাও। ড্রাই ক্যামেরা রিহার্সেল হবে। রুহ্ আফজা আর ভ্যাসলিনের একটা মিকচার করে বাচ্চাটার গায়ে মাখাও। দেখেই যেন মনে হয়, এইমাত্র মা'র পেট থেকে বের

==========================================

হয়েছে। ভ্যাসলিন দিবে বেশি, রুহ আফজা কম।

আধঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল, একঘণ্টা লেগে গেল। ট্রলি ঠিকমতো বসছে না। জার্ক হচ্ছে। ট্রলি শট বাদ দিয়ে জুম দিয়ে কাজ হবে। বাচ্চার ফ্রেম থেকে ওয়াইড হবে।

গায়ে ভ্যাসলিন মাখার পর থেকেই বাচ্চা কাঁদছে। শটের জন্যে ভালো। ডাইরেক্টর কামাল 'ক্যামেরা' বললেন, ডাক্তারের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন তিনি বাচ্চার পা ধরে তাকে ঠিক সময়মতোই ফ্রেমে নিয়ে এলেন। জুমল্যান্স বাচ্চার মুখে ফোকাস করল। বাচ্চা শুরু করল বিকট চিৎকার। তখনি দুর্ঘটনা ঘটল। ডাক্তার মেয়ের হাত থেকে পিছলে বাচ্চা মেঝেতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না বন্ধ হয়ে গেল।

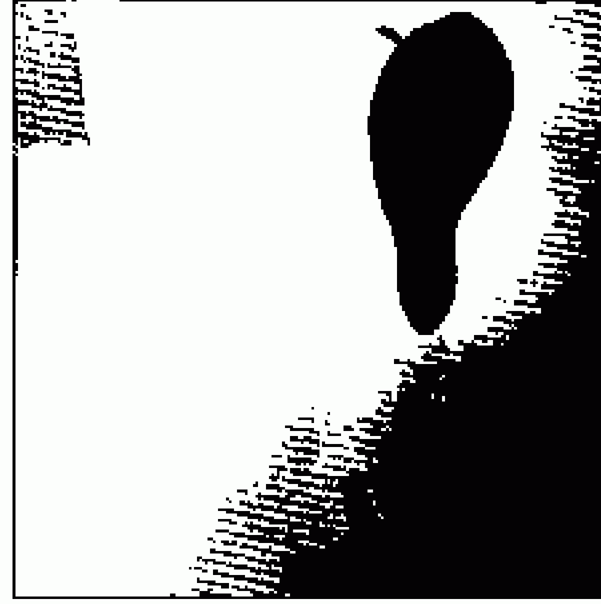
ডাইরেক্টর কামাল জাহেদার বাসায় এসেছেন। তিনি কথা বলে যাচ্ছেন। জাহেদা সেইসব কথা শুনছে না-কি শুনছে না তা বোঝা যাচ্ছে না। সে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। কামাল সাহেব বললেন, তোমার ছেলে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। শট শুরু হবার আগেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়। ডাক্তারের সার্টিফিকেটও আছে। চাইলে দেখাব। সার্টিফিকেটে লেখা— কজ অব ডেথ হার্ট অ্যাটাক। এইসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ হার্ট অ্যাটাকে মানুষের কোনো হাত নাই। তোমার ছেলে যদি তোমার কোলে শুয়ে থাকত তাহলেও হার্ট অ্যাটাক হতো। হার্ট অ্যাটাক এমনই জিনিস। যাই হোক, তারপরেও আমরা দশ হাজার টাকা দিলাম। এইখানে সই করে টাকাটা নাও। সই করতে না পারলে বুড়া আঙুলের টিপসই দাও।

জাহেদা টিপসই দিয়ে টাকা নিল। তার ছেলের প্রথম এবং শেষ রোজগার।

কুদ্দুস নয়া রিকশা কিনেছে। একটা টেবিলফ্যান কিনেছে। দিনে সে রিকশা চালায়। রাতে সে ফ্যানের বাতাসে ঘুমায়। ঠান্ডায় তার ভালো ঘুম হয়। জেগে থাকে জাহেদা। রাত গভীর হলে সে ছেলের নামে ছড়া কাটে—

আমার ছেলে রিকশা বায়
রইদে পুড়ে আগুলিয়া যায়।

=======================================



# আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ

মাসের প্রথম শুক্রবারে মীরার বাবা আফতাব নিজে বাজার করেন। তিনি চলে যান ধূপখোলার বাজারে। সেখানে বিক্রমপুরের তাজা মাছ আসে। পদ্মার মাছ। তার স্বাদই অন্যরকম। বড় মাছের দাম এখন সংগতির বাইরে চলে গেছে। তারপরও লোভে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ বড় মাছও কিনে ফেলেন। গত মাসে নিউমার্কেট কাঁচাবাজার থেকে মাঝারি সাইজের একটা চিতল মাছ কিনেছিলেন, তার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

আজ মাসের প্রথম শুক্রবার। আফতাব নাশতা শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন, তখন মীরা তার সামনে এসে দাঁড়াল। মীরার বয়স একুশ। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্স পড়ছে। থার্ড ইয়ার।

আফতাব বললেন, মা, কিছু বলবি ?

মীরা বলল, আজ মাছ কিনতে যাবে না ?

যাব। কেন ?

এন্নি জিজ্ঞেস করছি। বাবা, আমার খুব ইচ্ছা করে দেখি কীভাবে তুমি মাছ কেন ?

মাছওয়ালার সঙ্গে দরদাম করি, চেঁচামেচি করি, তোর দেখতে ভালো লাগবে না।

মীরা বলল, তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করছে। বাবা, আমাকে সঙ্গে নাও না প্লিজ।

আফতাব কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মেয়ে বড় হয়েছে কিন্তু ছেলেমানুষী এখনো যায় নি। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, উদ্ভট চিন্তাভাবনা। যাই হোক, রেডি হ।

বাবা! আরেক কাপ চা খাবে ? আমি নিজে বানাব।

তোকে বানাতে হবে না। হাত পুড়বি। তোর মা'কে বল। চা খেয়েই রওনা

=====================================

হব। দেরি করে গেলে ভালো মাছ কিছুই পাওয়া যাবে না।

মীরা চা বানাতে গেল। আফতাব টেলিফোন করলেন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু শামসুদ্দিনকে। সংসারের অতি খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি তাঁর বন্ধুকে না জানিয়ে পারেন না।

হ্যালো শামসু! এমন বিপদে পড়েছি।

কী বিপদ?

মীরাকে নিয়ে বিপদ। সে আমার সঙ্গে ধূপখোলা মাছের বাজারে যাবে।

ভালো তো, নিয়ে যাও।

ছোটবেলায়ও এরকম যন্ত্রণা করত। অফিসে যাব— গলা ছেড়ে কান্না। সঙ্গে যাবে।

বাপসোহাগী মেয়ে পেয়েছ। আমার বদমাইশটা কালও গাঁজা খেয়ে বাসায় ফিরেছে। তোমার ভাবি পালংকের কাঠ খুলে পিটিয়েছে। রক্তারক্তি কাণ্ড। ছেলে ছেলে করে জীবন দিয়ে দিয়েছিল। আজমীর শরীফে গিয়ে সুতা বেঁধে এসেছে ছেলের জন্যে। এখন ছেলের মজা বুঝছে। গাঁজা, ফেনসিডিল কোনোটাই বাদ নাই। আচ্ছা রাখি।

আফতাব প্রশান্ত মনে মেয়েকে নিয়ে রিকশায় করে বের হলেন। মাছ প্রসঙ্গে মেয়েকে নানান ধরনের জ্ঞান দিলেন। মীরা বাবার ডানহাত শক্ত করে ধরে আছে। আফতাব মনের আনন্দে গল্প করে যাচ্ছেন।

একেক সিজনের একেক মাছ। বোয়াল, চিতল খেতে হয় শীতে। তখন তাদের গায়ে চর্বি হয়। বর্ষার কই সবচেয়ে ভালো। কই তখন সাইজে ছোট থাকে, তবে মাংস থাকে মাখনের মতো নরম। রীঠা সবচেয়ে স্বাদু মাছ। একবার খেলে মুখে স্বাদ লেগে থাকে একমাস। তবে সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

রীঠা মাছ কিনতে হয় জীবন্ত। মরা মাছ বিস্বাদ।

মীরা বলল, আজ কী মাছ কিনবে বাবা?

আজ তুই যাচ্ছিস। তোর পছন্দে কিনব। তোর পছন্দ কী?

বড় চিংড়ি মাছ পাওয়া যাবে?

অবশ্যই পাওয়া যাবে। চিংড়ি কিনতে হয় কালার দেখে। চিংড়ির গা হতে হবে সবুজ।

বড় পাবদা মাছ কি পাওয়া যাবে বাবা?

পদ্মার ফ্রেস পাবদা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তবে সিলেটের হাওরের পাবদা

==========================================

অসাধারণ। দেখি তোর ভাগ্যে কী আছে। তোর যা যা পছন্দ সবই কিনব।

মীরা বলল, থ্যাংক য়্যু বাবা।

চিংড়ি পাওয়া গেল না, তবে টাটকা পাবদা পাওয়া গেল। কানকো নড়ছে এমন একটা আইড় মাছ পাওয়া গেল। বড় বড় কই পাওয়া গেল। চাষের কই না, দেশী কই। শেষটায় মাঝারি সাইজের একটা ইলিশ মাছও কেনা হলো। আফতাব টাকার দিকে তাকালেন না। মেয়ে প্রথমবার শখ করে মাছ কিনতে এসেছে। দু'দিন পর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। কার না কার হাতে পড়বে কে জানে! হয়তো জীবন পার করবে মলা মাছ আর কুচো চিংড়ি খেয়ে।

মীরার মা শাহানা চোখ কপালে তুলে বললেন, এত মাছ ?

মীরা বলল, হ্যাঁ, এত মাছ। সব রাঁধবে। ফ্রিজে তুলে রাখবে না।

কে খাবে ?

মীরা বলল, আমার এক বন্ধুকে আজ দুপুরে খেতে বলেছি মা।

বন্ধুটা কে ? অতসী ?

না, অতসী না।

তার নাম কী ?

নামের দরকার আছে মা ? সে অনেকদিন ভালোমন্দ কিছু খায় না। মেসে থাকে। একবেলা মেসে খায় একবেলা বাইরে খায়। মেসের খাবার কী জানো মা ? এক পিস ফার্মের মুরগি আর ডাল। সে ফার্মের মুরগি খায় না বলে শুধু ঝোল দিয়ে ভাত খায়।

ছেলে না মেয়ে ?

ছেলে। নাম শওকত।

শাহানা হতভম্ব গলায় বললেন, একটা ছেলেকে দুই দুপুরে খেতে বলেছিস ?

মীরা মা'র চোখ থেকে চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শাহানা বললেন, তোর সঙ্গে পড়ে ?

না।

কী করে ?

প্রাইভেট টিউশনি করে। অনেকদিন ধরে চাকরি খুঁজছে। পাচ্ছে না।

এরকম একটা ছেলের সঙ্গে তোর পরিচয় কীভাবে হলো ?

মীরা জবাব দিল না।

==========================================

সত্যি তাকে দুপুরে খেতে বলেছিস ?

হুঁ।

কবে বলেছিস ?

গতকাল। তার মেসে গিয়ে তাকে বলে এসেছি। সে খুব খুশি।

তার মেসে যেতে হলো কেন ?

ওর মোবাইল ফোন নেই মা। স্কলারশিপের টাকা পেয়ে আমি একটা কিনে দিয়েছিলাম। হারিয়ে ফেলেছে।

তুই তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিস ?

হুঁ।

তুই কি প্রায়ই তার মেসে যাস ?

হুঁ। মা, তোমার জেরা শেষ হয়েছে ? জেরা শেষ হলে রান্না শুরু কর। আমি ওকে ঠিক দু'টার সময় আসতে বলেছি।

হতভম্ব শাহানা বলল, ঐ ছেলেকে দেখে তোর বাবা কী বলবে এই নিয়ে ভেবেছিস ?

না।

তোর বাবার রাগ তুই জানিস। জানিস না ?

জানি।

সে ছেলের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে রাস্তায় ফেলে দিতে পারে। পারে না ?

পারে।

সেটা কি ছেলের জন্যে সম্মানের ব্যাপার হবে ? না-কি তোর জন্যে সম্মানের হবে ? আমার তো ধারণা পুরো ঘটনা জানার পর সে তোকে সুদ্ধ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলবে। তখন কী করবি ? তার মেসে গিয়ে উঠবি ? ফার্মের মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খাবি ?

মীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ ছলছল করছে। চোখ থেকে একফোঁটা পানি টপ করে মেঝেতে পড়ল। শাহানা চোখের পানি পড়ার দৃশ্যটা দেখলেন। তাঁর মন মোটেই নরম হলো না। তিনি কঠিন গলায় বললেন, ছেলের বাবা কী করে ?

বাবা মারা গেছেন।

যখন জীবিত ছিলেন তখন কী করতেন ?

মুদির দোকান চালাতেন।

ছেলের বাবা তাহলে বিজনেস ম্যাগনেট ?

==========================================

মীরার চোখ থেকে আরেক ফোঁটা পানি পড়ল। তার বাঁ চোখ থেকে আরেক ফোঁটা পানি পড়ল। বাঁ চোখ থেকেই পানি পড়ছে। ডান চোখ শুকনো।

শাহানা বললেন, এত বড় সাহস কীভাবে করলি ?

মীরা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ভুল হয়ে গেছে মা। আজ ওর জন্মদিন। আমাকে বলছিল প্রাইভেট টিউশনি থেকে আজ কিছু টাকা পাবে, তখন আমাকে নিয়ে কস্তুরি নামের একটা দোকানে রুই মাছের পেটি খাবে। ওর কথা শুনে মনটা এত খারাপ হয়েছে, দাওয়াত দিয়ে ফেলেছি।

এখন আসতে নিষেধ কর। টেলিফোন কর। বল Some other time.

ওর মোবাইল নেই মা।

যা, মেসে গিয়ে বলে আয়।

মেসে গেলে পাওয়া যাবে না। শুক্রবারে তার সারাদিন টিউশনি। একটা টিউশনি থেকে সরাসরি বাসায় আসবে।

কত বড় গজব যে হবে বুঝতে পারছিস ?

পারছি।

শাহানা কঠিন গলায় বললেন, যদি সাহস থাকে তোর বাবাকে গিয়ে বল। পাজি মেয়ে। খর্বদার আমার সামনে চোখের পানি ফেলবি না। গাধি।

মীরা বসার ঘরে গেল। বাবার সামনে দাঁড়াল। আফতাব খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ছুটির দিনে একই কাগজ তিনি দু'বার পড়েন। সকালে চা খেতে খেতে একবার। বাজার শেষ করে আরেকবার। আফতাব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, চোখ লাল কেন রে মা!

মীরা বলল, জানি না।

আফতাব বললেন, শখ করে বাজার করেছিস, যা আজ একটা আইটেম তুই রান্না কর কেমন।

বাবা,  আমি রাঁধতে জানি না।

তোর মা'কে বল দেখিয়ে দেবে। চিংড়ি রান্না খুব সহজ। প্রতিভা ছাড়া এই মাছ খারাপ রান্না করা যায় না।

মীরা রান্নাঘরে ফিরে এল। মায়ের সামনে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

শাহানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কান্না বন্ধ কর। টেবিলের ওপর থেকে পাঁচশ' টাকা নে। ওর আসার সময় হলে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবি। ওর হাতে পাঁচশ' টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলবি রুই মাছের পেটি খেয়ে নিতে। পরে এই নিয়ে তোর সঙ্গে জরুরি বৈঠক করব। গাধা মেয়ে।

===================================

মীরা মা'র সামনে থেকে সরে গেল। আফতাব সাহেব হাসিমুখে ঢুকলেন। স্ত্রীকে বললেন, এখনো রান্না শুরু কর নি! মাছ নরম হয়ে যাচ্ছে।

শাহানা বললেন, মাছ নরম হবে না। যথাসময়ে রান্না শেষ হবে।

আফতাব বললেন, সুজিতকে দুপুরে খেতে বললে কেমন হয়? বেচারা একা থাকে, বাবুর্চি কী রান্না করে না করে তার নাই ঠিক। ও গাড়ি কিনেছে, শুনেছ তো?

শুনেছি।

গাড়ি নিয়ে চলে আসুক। কী গাড়ি কিনল দেখলাম। তুমি কী বলো?

শাহানা জবাব দিলেন না। সুজিতের সঙ্গে মীরার বিয়ের কথাবার্তা হয়ে আছে। সে ডাক্তার। লন্ডন থেকে FRCS ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। তার বাবা-মা মীরাকে পছন্দ করে আংটি পরিয়ে গেছেন। মীরা সেই আংটি পরছে না। মা'কে বলেছে, আংটিটা বড় হয়েছিল আঙুল থেকে কোথায় যেন খুলে পড়ে গেছে। শাহানা মেয়ের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। এখন বুঝতে পারছেন ঘটনা কী।

আফতাব বললেন, কী, কথা বলছ না কেন?

শাহানা বললেন, আজ পিতা কন্যা বাজার করে এনেছ। তোমরাই খাওয়াদাওয়া কর। বাইরের কাউকে ডাকলে ফর্মাল ব্যাপার চলে আসবে।

তাও ঠিক। মীরাকে চিংড়ি মাছ কীভাবে রাঁধতে হয় শিখিয়ে দাও। দেখি তোমার মেয়ের হাতের রান্নার কী অবস্থা।

শাহানা বললেন, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু কথা আছে। এখন বলব, না পরে বলব বুঝতে পারছি না।

গলির মোড়ে শওকতকে দেখা গেল। সে আজ ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি পরেছে। পায়ে নতুন স্যান্ডেল। আজই চুল কেটেছে বলে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার হাতে দোলনচাঁপা ফুলের তোড়া। মীরা এগিয়ে গেল।

শওকত বলল, দেরি করে ফেললাম?

মীরা বলল, না।

শওকত বলল, টিউশনির টাকাটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে দেরি হলো।

পেয়েছ?

পেয়েছি। এই টাকাতেই তো নতুন স্যান্ডেল কিনলাম। ভয়ঙ্কর খিদে লেগেছে। মীরা, তোমাদের বাসায় রান্না কী? ভালো কথা, তোমার বাবা-মা আমাকে দেখে আপসেট হবেন না তো?

==========================================

মীরা বলল, আজ বাসায় একটা সমস্যা হয়েছে। অনেক লোকজন চলে এসেছে। আজ বাসায় তোমাকে নেব না।

ও আচ্ছা।

আস, এই রেস্টুরেন্টে ঢুকি। কিছু খেয়ে নাও। রুই মাছের পেটি পাওয়া যায় কি-না দেখ। আমি বাসায় চলে যাচ্ছি। এই টাকাটা রাখ।

টাকা লাগবে না। টাকা আছে।

প্লিজ টাকাটা রাখ তো। আজ আমার নিমন্ত্রণ।

রেস্টুরেন্টে আছে শুধু তেহারি। মুরগির ঝালফ্রাই ছিল। শেষ হয়ে গেছে।

শওকত তেহারি অর্ডার দিয়েছে। বয়কে বিনীত গলায় বলল, ঝালফ্রাইয়ের ঝোল যদি থাকে আলাদা করে একটু ঝোল দেবেন।

তেহারি চলে এসেছে। মুরগির ঝালফ্রাইয়ের ঝোল এসেছে। পেঁয়াজ কাঁচামরিচের সালাদ এসেছে। শওকত খাওয়া শুরু করবে, তখনি আফতাব ঢুকলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন শওকতের দিকে। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার নাম শওকত?

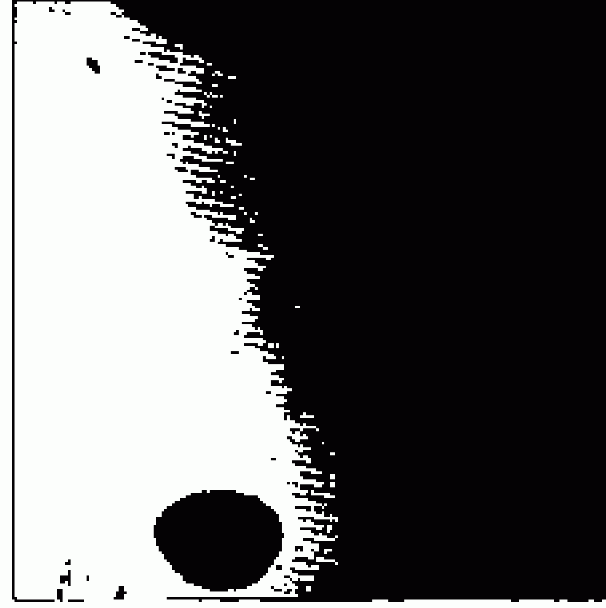
শওকত থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। আফতাব বললেন, আমার মেয়ে তোমাকে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করেছে?

জি স্যার!

টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে, খেতে আস। আমার মেয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আফতাব সাহেব ছেলের পিঠে হাত রাখতে রাখতে বললেন, আমার মেয়েটা খুব কাঁদছে। এত কান্নার কী আছে বুঝলাম না। সে আজ জীবনের প্রথম চিংড়ি মাছ রান্না করেছে। খেয়ে দেখ তো কেমন।

==========================================



# আনোভা

স্যার, আমার নাম মকবুল। আমেরিকানরা মকবুল বলতে পারে না। তারা ডাকে ম্যাক। কেউ কেউ ডাকে ম্যাকবুল। শুরুর দিকে আপত্তি করতাম। বলতাম, ম্যাকবুলের চেয়ে মকবুল উচ্চারণ অনেক সহজ। খামোকা কঠিন নামে কেন ডাক ? শেষের দিকে এইসব বলা ছেড়ে দিয়েছি। আমেরিকানরা নিজে যা বুঝে তাই। যুক্তির ধার ধারে না।

কাগজপত্র ছাড়া আমি আমেরিকায় তেরো বছর কাটিয়ে পশুর মতো স্বভাবের হয়ে গিয়েছিলাম। পশু যেমন মানুষকে দেখেই আতঙ্কে অস্থির হয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, আমিও তাই করতাম। পুলিশ দেখলে বুকে এবং তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হতো। ব্যথা মাঝে মাঝে এমন তীব্র হতো যে, বাথরুমে ঢুকে বমি করতাম।

রাতে থাকতাম কিছু মেক্সিকানদের সঙ্গে। তারা ড্রাগ নিত, তবে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। তাদের জন্যে প্রতিরাতেই খিচুড়ি রাঁধতাম। তারা আমার খিচুড়ি ড্রাগস-এর মতোই আগ্রহ করে খেত। খিচুড়িকে তারা বলত 'কিচলি'।

খিচুড়ি রান্না আমি দেশ থেকে শিখে আসি নি। কেউ আমাকে শেখায়ও নি। সম্পূর্ণই আমার নিজের আবিষ্কার। হাতের কাছে যা পেতাম, সবই বড় একটা হাঁড়িতে চড়িয়ে জ্বাল দিতে থাকতাম। প্রচুর ঝাল দিতাম। রান্না শেষ হবার পর ডাল বাগাড়ের মতো বাটারে বাগার দিতাম। খিচুড়ি খাবার সময় মেক্সিকান বন্ধুরা বেশির ভাগ সময় ঝালের কারণে হাঁ করে থাকত। তারপরেও নিজেদের মধ্যে মেক্সিকান ভাষায় বলাবলি করত, 'কিচলি জগতের শ্রেষ্ঠ খাবার।'

আমি আমার এই ম্যাক্সিকান বন্ধুদের কারণেই গ্রিনকার্ড পাই। তাদের একজন আমাকে গাড়ি চালানো শেখায় এবং খোদ নিউইর্য়ক শহরে আমি ক্যাব চালাতে শুরু করি। সবই সম্ভব হয় খিচুড়ি নামক অখাদ্য এক রান্নার কারণে।

আমি ক্যাব চালাতাম রাতে। দিনে ঘুমাতাম। রাতে ডলার বেশি পেতাম।

==========================================

ট্রাফিকও থাকত কম। তবে রাতে ক্যাব চালানোয় সমস্যাও ছিল। অনেক দুষ্টলোক যাত্রী সেজে ক্যাবে উঠত। তারপর পিস্তল দেখিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে নিত। কয়েকজন ক্যাব চালক সন্ত্রাসীদের হাতে গুলি খেয়ে মারাও গেছে। ক্যাব পরিচালনা সংস্থাগুলি নানান নিয়মাবলি ক্যাব চালকদের জন্যে তৈরি করেছিলেন। যাতে তাদের জানমালের ক্ষতি না হয়। যেমন—

১. ওয়াকিটকি সর্বক্ষণ খোলা রাখবে।

২. কেউ পিস্তল ধরলে তার সঙ্গে আর্গুমেন্টে যাবে না। সে যা চায় সবই দিয়ে দিবে।

৩. সন্দেহজনক কাউকে গাড়িতে তুলবে না। ভদ্রভাবে তাকে নিষেধ করবে। যেমন— গাড়ির ইজেকশন ফুয়েল আমাকে ট্রাবল দিচ্ছে, এখন তোমাকে নিতে পারছি না, সরি।

এইসব নিয়মকানুন আমি মোটেই মানতাম না। সবাইকে গাড়িতে তুলতাম। আমার তখন প্রচুর ডলার দরকার। অনেকদিন দেশে যাই না। দেশে যাব। সম্ভব হলে বিয়ে করব। মা চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি মেয়ে দেখে রেখেছেন। মেয়ে 'ইন্টার' পাস। গাত্রবর্ণ অত্যন্ত পরিষ্কার। নাম কমলা।

অতি লোভে একবার মহাবিপদে পড়লাম। স্যার, আপনাকে সেই গল্পটাই বলব। আপনি লেখক মানুষ, অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনেছেন— আমি যে গল্প বলব সেটা শুনেন নাই। এখন স্যার আমাকে যদি তিন মিনিট সময় দেন, তাহলে বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট খাব। আপনার সামনে সিগারেট খাওয়ার মতো বেয়াদবিটা করব না। এই গল্পটা করার সময় আমার খুব টেনশন হয়। তখন সিগারেট না খেয়ে পারি না।

ডিসেম্বর মাসের শেষ। কয়েক বছর পর সেবারই খুব বরফ পড়েছে। ক্রিসমাসে বরফ ছিল না, হোয়াইট ক্রিসমাস হয় নি। ছাব্বিশ তারিখ থেকে শুরু হলো তুষারপাত। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। সেই দেশে ঝড়ো হাওয়াকে বলে ব্লিজার্ড। ব্লিজার্ডের সময় অফিস-আদালত ছুটি হয়ে যায়। জমিয়ে সবাই আড্ডা দেয়, পোকার খেলে, বিয়ার খায়। ধনী দেশ তো! তারা কষ্টটাকেও আনন্দ বানিয়ে ফেলে।

আমি ইয়েলো ক্যাব নিয়ে ঘুরি। অতিরিক্ত ভাড়া পাওয়া যায়। আমার কাছে ব্লিজার্ড বড় ব্যাপার না। ডলার জমানো বড় ব্যাপার।

একজন লং রুটের যাত্রী পেলাম। সে যাবে নিউজার্সি। তার না-কি বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষুনি যেতে হবে। সে বলল, ব্লিজার্ডের রাতে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি ভালো টিপস দেব।

==========================================

আমি সাহেবকে নিয়ে গেলাম। ভালো টিপস পেলাম। ভাড়ার ওপর একশ' ডলার। ফেরার পথে পড়লাম বিপদে। হুলস্থূল ব্লিজার্ড শুরু হলো। এমন তুষারপাত আমি জন্মে দেখি নাই। যেন একসঙ্গে কয়েক লক্ষ বস্তা শিমুল তুলা কেউ আকাশ থেকে ছেড়ে দিচ্ছে। গাড়ি নিয়ে আগানোই মুশকিল। রাস্তার বরফ জমে কাচ হয়ে গেছে। গাড়ি সমানে স্কিড করছে। আমি সাবধানে এগুচ্ছি। হাইওয়েতে বড় বড় ট্রাক ছাড়া কোনো গাড়ি নেই। রাত তেমন হয় নি। দশটা, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। হাইবিম দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি যাতে অনেকদূর দেখা যায়। হাইবিমে কাজ হচ্ছে না। দশ গজ সামনেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির ফগ লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছি, তাতেও উনিশ-বিশ হচ্ছে না। হঠাৎ দেখলাম একটা মেয়ে রাস্তার পাশে আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে আছে, লিফট চায়।

ভয়াবহ দুর্যোগের রাতে এই মেয়েটা এখানে কেন ? অনেক সময় হুকাররা এরকম দাঁড়ায়। লিফট চায়। পরে নানান ঝামেলা করে। খুনখারাবি পর্যন্ত হয়। স্যার, হুকার বুঝেছেন তো ? ঐ দেশে বেশ্যা মেয়েদের বলে হুকার।

এই মেয়েটি হুকার না। তার সঙ্গে বাচ্চা একটা মেয়ে আছে। সম্ভবত তার মেয়ে। তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আমি গাড়ি থামালাম। দরজা খুলে দিলাম। তরুণী বাচ্চা একটা মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, Sir thank you.

কালো ক্যাব ড্রাইভারকে কেউ স্যার ডাকে না। আমি তরুণীর ভদ্রতায় মুগ্ধ হলাম। মেয়েটি অতি রূপবতী। কোনো আমেরিকান মেয়েকে আমার কাছে রূপবতী লাগে না। মনে হয় ধবল কুষ্ঠের রোগী। এই মেয়েটির চুল সোনালি। দেখতে ছবির মতো। তার বাচ্চাটার চুলও সোনালি। বাচ্চাটা ঠান্ডায় কাহিল হয়ে আছে। সে মনে হয় ক্ষুধার্ত। ফিসফিস করে মা'কে কী যেন বলল। তার মা লজ্জিত গলায় বলল, আমার মেয়েটা বার্গার খেতে চায়। তোমার পক্ষে কি সম্ভব হবে সামনের কোনো সার্ভিস স্টেশনে গাড়ি থামানো ?

আমি বললাম, অবশ্যই সম্ভব।

আমার মেয়ের নাম আনোভা। ওর কাছে ফুড কেনার মতো ডলার আছে।

স্যার কি বুঝতে পারছেন যে কথাবার্তা সব ইংরেজিতে হচ্ছে ? আমি আপনাকে বলছি বাংলায়। কারণ হুবহু কথাগুলি মনে নাই।

অনেক ঝামেলা করে সার্ভিস স্টেশনে পৌঁছলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি আনোভা চুপচাপ বসে আছে। তার হাতে একশ' ডলারের একটা নোট। আনোভার মা নেই। সে যাবে কোথায় ? একটা মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে সে নেমে পড়েছে তাও হবে না। গাড়ির দরজা লক করা।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, তোমার মা কোথায় ?

আনোভা বলল, Gone.

আমি বললাম, Gone মানে ? কোথায় গন ?

আনোভা কোনো জবাব দিল না। প্রশ্ন করলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর চোখ নামিয়ে নেয়।

মেয়েটাকে বার্গার কিনে দিলাম। আইসক্রিম কিনে দিলাম। সে আগ্রহ করে বার্গার খাচ্ছে। তার মা হাওয়া হয়ে গেছে, এতে তাকে কোনোরকম চিন্তিত মনে হলো না।

সার্ভিস স্টেশন থেকেই আমি পুলিশকে টেলিফোন করে ঘটনা জানালাম। তবে মেয়েটার মা যে গাড়িতেই হাওয়া হয়ে গেছে এই তথ্য গোপন করলাম। এই কথা বললে পুলিশ আমাকে মানসিক রোগী ভাববে। আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। ক্যাব ড্রাইভিং-এর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।

আমি বললাম, মা-মেয়েকে গাড়িতে তুলে একটা সার্ভিস স্টেশনে নিয়ে এসেছি। মেয়েটাকে রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করছি— দেখি মেয়ের মা আসছে না। তার খোঁজে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি সে নেই।

মেয়েটা কত বড় ?

পাঁচ-ছয় বছর হবে।

তাকে টেলিফোন দাও। আমি তার সঙ্গে কথা বলি।

ওপাশ থেকে পুলিশ কী বলল আমি শুনতে পাচ্ছি না। মেয়েটা কী বলছে শুনছি। প্রথম বলল, 'আনোভা।'

তারপর বলল, 'ফোর এন্ড হাফ।' মনে হয় বয়স বলল। তারপর বলল, 'Gone'. তারপর শুধু No. কয়েকবার No বলার পর বলল, Ok.

সে টেলিফোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। পুলিশ আমার লাইসেন্স নাম্বার, ঠিকানা, সব হাবিজাবি নিয়ে বলল, তুমি নিউইয়র্কে মেয়েটাকে নিয়ে চলে এসো। সরাসরি আমাদের কাছে আসবে। পুলিশের একটা পেট্রোল কার আধাঘণ্টার মধ্যে সার্ভিস স্টেশনে পৌছে যাবে। সেই কার তোমাকে ফলো করবে। পেট্রোল কার না আসা পর্যন্ত তুমি মুভ করবে না।

স্যার, কী যে দুশ্চিন্তায় পড়লাম বলার না। আমার ধারণা হলো, পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে। হয়তো ভাববে মেয়েটার মা'কে আমি খুন করে বরফের গাদায় ডেডবডি লুকিয়ে রেখেছি। ঐ দেশের পুলিশ যে কত খারাপ আপনি চিন্তাই করতে পারবেন না।

==============================================

যাই হোক, পুলিশের গাড়ি মেয়েটাকে নিয়ে চলল। আমি যাচ্ছি পেছনে পেছনে। মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়ছি।

প্রিসিংটে, স্যার ওদের দেশের থানাকে বলে প্রিসিংট, আমাকে ছয় ঘণ্টা আটকে রাখল। মেয়েকে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করল।

তোমার বাবার নাম কী ?

মা'র নাম কী ?

কোথায় থাক ?

কোন স্কুলে পড় ?

প্রিয় বান্ধবীর নাম কী ?

তোমার কি কোনো 'পেট' আছে ?

আনোভা কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিল না। কঠিন মেয়ে। ছয় ঘণ্টা পর আমি ছাড়া পেলাম। মেয়েটাকে তারা রেখে দিল।

বাসায় ফিরে আমি দশ রাকাত নফল নামাজ পড়লাম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কারণে। যদিও জানি উদ্ধার এখনো পাই নি। যে-কোনো সময় পুলিশের কাছ থেকে ডাক আসবে।

কুড়ি দিনের দিন ডাক পড়ল। গেলাম। পুলিশ অফিসার বললেন, আনোভার কোনো ট্রেস তারা বের করতে পারে নি। চেষ্টা পুরোদমে চলছে।

স্যার কি জানেন আমেরিকার মতো সভ্য দেশে হাজার হাজার শিশু প্রতিবছর হারিয়ে যায় ? পুলিশ তার কোনো হদিস বের করতে পারে না।

আমি বললাম, স্যার মেয়েটা কোথায় ?

মেয়েটাকে একজন Foster Parent-এর কাছে দেয়া হয়েছে।

আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি ?

সাইকিয়াট্রিস্ট অনুমতি দিলে দেখা করতে পারবে। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

আমি কি যেতে পারি ?

পার। তুমি মেয়েটিকে দেখতে চাচ্ছ তা সাইকিয়াট্রিস্টকে জানানো হবে। সাইকিয়াট্রিস্টই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তার নাম পল।

তিন মাস পার হয়ে গেল। কেউ যোগাযোগ করল না। ধরেই নিলাম সাইকিয়াট্রিস্ট চান না আমি দেখা করি। আমেরিকা হচ্ছে স্যার মাথা খারাপের দেশ। সবচে' বড় মাথা খারাপ সাইকিয়াট্রিস্ট হারামজাদাগুলার। খারাপ গালি ব্যবহার করেছি স্যার, কিছু মনে করবেন না।

==========================================

তিন মাস পার হবার পর এক সোমবারে সাইকিয়াট্রিস্ট আমাকে টেলিফোন করলেন।

আমি বললাম, স্যার, মেয়েটি কেমন আছে?

সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, ভালো আছে। সে কথা খুব কম বলে এটাই সমস্যা, আর কোনো সমস্যা নেই।

তার মা-বাবার নাম এইসব কি বলেছে?

না। মনে হচ্ছে তার জীবনের শুরু হয়েছে তোমার টেক্সি ক্যাবে ওঠার পর। বড় ধরনের অ্যামনেশিয়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কেটে যাবে।

আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে পারি?

পার। সে চকলেট খুব পছন্দ করে। এক প্যাকেট চকলেট নিয়ে যেতে পার।

স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ।

তোমার সঙ্গে মেয়েটির কী কথা হয় সবই কিন্তু রিপোর্ট করবে।

আনোভা আমাকে দেখে যে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তা-না। সামান্য হাসল। চকলেটের প্যাকেট হাতে নিল। মাথা নিচু করে বলল, থ্যাংক য়্যু।

আমি এক ঘণ্টা সেই বাড়িতে ছিলাম। আনোভার ফোস্টার মাদার আমাকে কফি খাওয়ালেন। নানান গল্প করলেন। সবই রাজনৈতিক। তিনি ডেমোক্রেট দলের একজন। তার গল্পের সবটাই রিপাবলিকানদের বদনাম।

যতক্ষণ আমি থাকলাম, ততক্ষণই আনোভা আমার পিঠে হেলান দিয়ে বসে রইল। আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শরীরের স্পর্শ পাচ্ছি।

একসময় ঘরে শুধু আমি আর আনোভা। বাড়িওয়ালি লনে ঘাস কাটতে গিয়েছে। ঘাস কাটা মেশিনের শব্দ হচ্ছে। আমি বললাম, আনোভা, যাই?

আনোভা পেছন থেকে একটা হাত এনে আমার সামনে ধরল। সেখানে একশ' ডলারের একটা নোট। আনোভা স্পষ্ট গলায় বলল, মা তোমাকে এই ডলারটা দিতে বলেছিল। তুমি নাও। না নিলে She will be sad.

আমি ডলার নিতে নিতে বললাম, তুমি কি তোমার মা'র বিষয়ে আর কিছু আমাকে বলবে?

আনোভা বলল, No.

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আমার খুবই জানতে ইচ্ছা করে।

আনোভা আমাকে অবাক করে দিয়ে ফিসফিস করে পরিষ্কার গলায় বলল, আমার মা'র সঙ্গে তোমার আরো একবার দেখা হবে।

==================================================

কোথায় ? কখন ?

আনোভা জবাব দিল না।

স্যার, মেয়েটার সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। সাইকিয়াট্রিস্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করল। আমি চলে আসার পর মেয়েটি না-কি খুব কেঁদেছে। কাজেই আমি তার ওপর মেন্টাল ট্রেস তৈরি করেছি। Trauma না কী যেন হয়েছে। হারামজাদা দেশ তো স্যার। হারামজাদা দেশের হারামজাদা নিয়মকানুন। Mother Fuck Country.

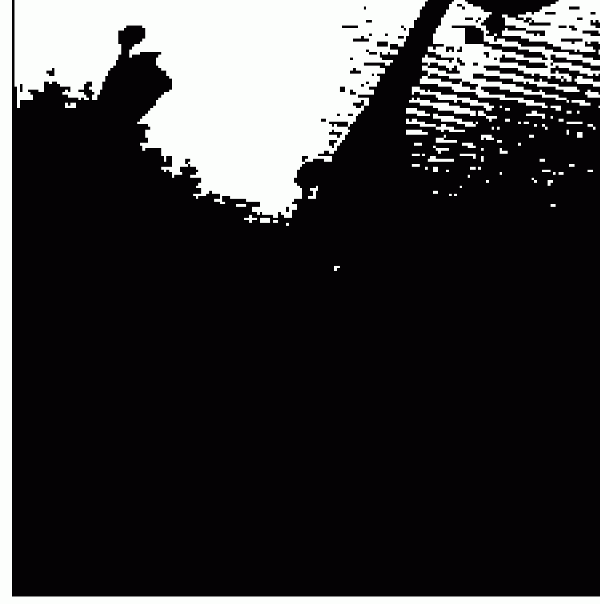
স্যার, সরি। বেশি রেগে গিয়েছি। কী বলতে কী বলছি। বেয়াদবি নিজগুণে মাফ করবেন।

মেয়েটার জন্যে তারা নতুন Foster Family বের করে। তার ঠিকানা আমি জানি না। একবার শুনেছি স্কুলে সে খুব ভালো করছে। তাকে সাধারণ স্কুল থেকে সরিয়ে Gifted Children-এর স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার পর দশ বছর কেটে গেছে। আমি আমার মতো আছি। ক্যাব চালাই। ব্যাংকে টাকা জমাই। ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখে ঘোরাঘুরি করি ঐ রাস্তায়, যেখানে প্রথম আনোভা এবং তার মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যদি সেই মহিলার সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হয় নি।

আনোভার দেয়া একশ' ডলারের নোটটা এখনো আমার কাছে আছে। স্যার, নোটটা কি দেখবেন ?

================================================



# তিনি

ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। জুলফির চুল সব পাকা। মাথার চুলও পাকা, তবে কলপ দেবার অভ্যাস আছে। কলপের কারণে মাথার চুল কাঁচা মনে হচ্ছে, যদিও চুলের গোড়া সাদা হয়ে আছে। তার পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির রঙ সামান্য হলুদ। কাপড়ের রঙের ভাষায় একেই সম্ভবত অফ হোয়াইট বলে। গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে একটু লম্বা। গায়ের রঙ গৌঢ়। মুখমণ্ডলে চারকোণা ভাব আছে। পশ্চিমবঙ্গের ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চেহারার সঙ্গে তার চেহারার ভালো মিল আছে। তবে এই ভদ্রলোক সুনীলের মতো স্থূলকায় না। ভদ্রলোকের চোখে মেটালিক ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচ তেমন ভারি না। কাচের ভেতর দিয়ে তার চোখ দেখা যাচ্ছে। চোখে ভরসা হারানো দৃষ্টি।

ভদ্রলোকের বড় ধরনের একটা সমস্যা হয়েছে। তিনি কিছুই মনে করতে পারছেন না। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এলিফ্যান্ট রোডের চশমার দোকানের সামনে। তার বাঁপাশে একটা লোক পেয়ারা বিক্রি করছে। রাস্তায় এবং ফুটপাথে প্রচুর ভিড়। খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে থেকে তিনি লোক চলাচলের অসুবিধা করছেন। পেয়ারাওয়ালার দিকে একটু সরে গেলেন এবং বিস্ময়ের সঙ্গে চারপাশ দেখতে লাগলেন।

মানুষের সাময়িক ব্ল্যাকআউট হয়। ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গেলে হয়। রক্তের সুগার বা অক্সিজেন কমে গেলে হয়। কিন্তু তার হয়েছেটা কী ? স্থায়ী ব্ল্যাকআউট হয়ে গেছে ? তিনি তার নাম মনে করতে পারছেন না। বাসা কোথায় মনে করতে পারছেন না। এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন এবং কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন তাও মনে করতে পারছেন না। আতঙ্কে অস্থির হয়ে যাবার মতো ব্যাপার ঘটেছে। তবে তিনি এখনো অস্থির হন নি। পুরো ঘটনায় বিস্ময় বোধেই অভিভূত হয়েছেন। তার চিন্তাশক্তি যে কাজ করছে এতেই তিনি খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করছেন। তার নিজেকে বুদ্ধিমান মানুষ বলে মনে হচ্ছে। একজন বুদ্ধিমান মানুষ নিজেকে খুঁজে পাবেই। তিনি

==========================================

পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলেন। পকেটে মানিব্যাগ থাকবে। একটা মোবাইল টেলিফোন থাকবে। যেখান থেকে ঠিকানা বের করা তিন-চার মিনিটের ব্যাপার।

পকেটে মোবাইল নেই, মানিব্যাগও নেই। একটা রুমাল আছে। বাম পকেটে কিছু টাকা পাওয়া গেল— দু'শ তেত্রিশ টাকা। টাকাটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। টাকার সঙ্গে একটা ছোট্ট কাগজে লেখা 'রসমালাই'। তিনি কি দুই'শ তেত্রিশ টাকা নিয়ে রসমালাই কিনতে বের হয়েছেন ? তাহলে তো তার মিষ্টির দোকানের সামনে থাকার কথা। এখানে আশেপাশে কোনো মিষ্টির দোকান নেই। সারি সারি জুতার দোকান।

তার কাছে একটা মানিব্যাগ কেন থাকবে না ? এটা হতে পারে তিনি মানিব্যাগ গাড়িতে ফেলে এসেছেন। হয়তো তার গাড়ি আছে। গাড়ির পেছনের সিটে মানিব্যাগ এবং মোবাইল পড়ে আছে।

একটু দূরে তিন-চারটা গাড়ি পার্ক করা। এর কোনো একটা কি তার ? একটা প্রায় নতুন পাজেরো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। পাজেরো গাড়িটা কি তার ? যার একটা এত বড় পাজেরো গাড়ি থাকবে সে দুই'শ তেত্রিশ টাকা রাবার ব্যান্ডে বেঁধে পকেটে রেখে ঘুরবে না। তবে পয়সাওয়ালা লোকদের মধ্যে নানান একসেনট্রিসিটি থাকে। তার মধ্যেও হয়তো আছে। তিনি গাড়িগুলির দিকে এগুলেন। কোনো গাড়ির ড্রাইভার এগিয়ে এল না। তিনি পেয়ারাওয়ালার কাছে ফিরে গেলেন। নতুন পৃথিবীতে পেয়ারাওয়ালাটাকেই তার আপন মনে হচ্ছে। যদিও লোকটা নোংরা, যে পানিতে পেয়ারা ধুচ্ছে সেটা নোংরা— কুচকুচে কালো পানি। ধারালো একটা ছুরি দিয়ে কচকচ করে সে পেয়ারা কাটছে। ছুরিটা ঝকঝক করছে। খবরের কাগজের কাটা অংশে বিট লবণ মাখিয়ে পেয়ারা দিচ্ছে, সেই কাগজও নোংরা। মনে হয় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে।

পেয়ারা কত করে ?

পাঁচ টাকা পিস।

বড়টাও পাঁচ টাকা ছোটটাও পাঁচ টাকা ?

সব একদর। কোনটা নিবেন বলেন কাইটা দেই।

তিনি সময় নিয়ে পেয়ারা বাছলেন, প্রধান কারণ কিছু সময় কাটানো। এর মধ্যে যদি ঝট করে সবকিছু মনে পড়ে। তাছাড়া তার মন বলছে তার এখানেই থাকা উচিত। কেউ তার খোঁজে এলে এখানেই আসবে।

বিট লবণ দিয়ে বেশ আগ্রহ করে তিনি পেয়ারা খেলেন। পেয়ারাগুলি ভালো। বাসার জন্যে কিছু নিয়ে গেলে হয়। সমস্যা একটাই— বাসা কোথায় তিনি জানেন না। বাসায় কে কে আছে তাও জানেন না। তাদের চেহারা কেমন কে জানে ?

==================================

নিজের চেহারাও দেখতে ইচ্ছা করছে। সেটা কোনো সমস্যা না। চশমার দোকানে ঢুকে পড়েলেই হলো। চশমার দোকানে ঢোকার প্রয়োজনও আছে। হয়তো তিনি চশমার অর্ডার দিতে এসেছিলেন। তা না হলে চশমার দোকানগুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন ? তার চশমার ফ্রেমটাও এদের দেখানো দরকার। যদি চশমার ফ্রেম দামি হয় তাহলে নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। সস্তা ফ্রেম হলে এলেবেলে ধরনের কেউ। রিটায়ার্ড স্কুল টিচার।

একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। তার মানে কি এই যে, তিনি একজন স্মোকার ? স্মোকার হলে পকেটে সিগারেটের প্যাকেট থাকত। মুখে সিগারেটের গন্ধ থাকত। তিনি তো পেয়ারাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না— এই, আমার মুখটা শুঁকে দেখ তো মুখে সিগারেটের গন্ধ আছে কি-না।

তিনি চশমার দোকানে ঢুকলেন। আয়নায় নিজেকে দেখলেন। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখে অবাক হলেন। তার মানে শেভ না করেই বের হয়েছেন। তিনি কি অতি সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার কেউ ? যার প্রতিদিন শেভ করা এক ধরনের বিলাসিতা। তিনি চোখ থেকে চশমার ফ্রেম খুলে সেলসম্যানকে বললেন, ভাই, এই ফ্রেমটা একটু দেখুন তো ?

কী দেখব ?

ফ্রেমটা কত দামের এটা দেখবেন। ঠিক এই ধরনের আরেকটা ফ্রেম কিনব।

সাধারণ চায়নিজ ফ্রেম, দু'শ আড়াইশ টাকা দাম হবে। আমাদের কাছে একই রকম দেখতে ভালো জার্মান ফ্রেম আছে। দাম সামান্য বেশি পড়বে। দেখাব ?

থাক। আরেকদিন দেখব।

তিনি প্রতিটি চশমার দোকানে গেলেন। যদি কেউ তাকে দেখে বলে— 'স্যার আপনি! কিছু ফেলে গেছেন ?' যদি এরকম কিছু বলে তাহলে তিনি বলবেন— কিছু ফেলে যাই নি। অর্ডার যেটা দিয়েছি সেই অর্ডার স্লিপটা দেখব। বাসার ঠিকানা ভুল দিলাম কি-না।

চশমার দোকানের কেউ কিছু বলল না। তিনি বাইরে এসে একটা সিগারেট কিনলেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় যদি কিছু হয়। সিগারেট ধরিয়ে আনন্দ পেলেন। তার জীবন পুরোপুরি কর্মশূন্য হয়ে যায় নি— এই ভেবে আনন্দ। তার চিন্তাশক্তি যে নষ্ট হয়ে যায় নি এটাও একটা সুসংবাদ। স্মৃতিশক্তিহীন মানুষ যদি লজিকও হারিয়ে ফেলে তাহলে তাকে যা বলা হবে তা হলো পাগল। সে তখন রাস্তায় ট্রাফিক কনট্রোল করবে। পাগলরা ট্রাফিক কনট্রোল করতে অত্যন্ত ভালোবাসে। শুরুতে কাপড় গায়ে দিয়েই ট্রাফিক কনট্রোল করে, তারপর এক বিশেষ মুহূর্তে গায়ের সব কাপড় খুলে নতুন উদ্যমে ট্রাফিক কনট্রোল শুরু করে।

==========================================

পাগল সম্পর্কে এই চিন্তাটা যে তার এসেছে এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছেন। মানুষের পরিচয় তার স্মৃতিশক্তিতে না, মানুষের পরিচয় তার চিন্তায়।

তিনি সিগারেটের দোকানির দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, ভাই আপনার নাম কী ?

সিগারেটের দোকানি অবাক হয়ে বলল, আমারে জিগান ?

হ্যাঁ।

নাম দিয়া কী করবেন ?

এম্নি জানতে চাচ্ছি। একটা পশুর সঙ্গে আরেকটা পশুর যখন দেখা হয়, তখন তারা কিন্তু কেউ কারো নাম জানতে চায় না। মানুষ চায়।

দোকানি খানিকটা ভীত গলায় বলল, কালাম।

আপনার নাম কালাম ?

জি।

ভেরি গুড। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি আমার নামটা আপনাকে বলতে পারছি না। দুঃখিত।

দোকানি অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তিনি সিগারেটের শেষ টান দিয়ে উৎসাহিত ভঙ্গিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কালো রঙের বিশাল একটা গাড়ি এসে থেমেছে। গাড়ির পেছনের সিটে সতেরো-আঠারো বছরের যে তরুণী বসে আছে, সে হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার চেহারা শ্যামলা। চোখ বড় বড়। তার নিজের চোখও বড় বড়। কিছুক্ষণ আগে চশমার দোকানে দেখেছেন। মেয়েটি তারই মেয়ে এটা মনে হয় ধরে নেয়া যায়। বাবাকে এখানে রেখে কোনো একটা কাজে গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে। বাবাকে নিয়ে বাসায় যাবে।

তিনি গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়ালেন। একটু ঝুঁকে এলেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি বলল, আপনি কী চান ?

তিনি বললেন, কিছু চাই না।

মেয়েটি দ্রুত জানালার কাচ তুলে দিচ্ছে। তার দৃষ্টিতে ভয়। তিনি মন খারাপ করলেন। মন খারাপ এ জন্যে না যে মেয়েটা তার না। মন খারাপ কারণ মেয়েটি ভয় পেয়েছে। ভয় পাবে কেন ? তার চেহারায় কি পাগল পাগল ভাব এসে গেছে ?

তিনি কালামের কাছে ফিরে এসে আরেকটা সিগারেট কিনলেন। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন কালামের চোখেও ভীত ভাব। তার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ির কারণে কি এটা হচ্ছে ? সম্ভাবনা আছে। চুলও অনেক বড় হয়েছে। পাগলদের চুল দাড়ি বড় থাকে। তারা কখনো নাপিতের কাছে যায় না।

==========================================

কালাম! এখানে নাপিতের কোনো দোকান আছে ? সেভ করব।

কালাম হাতের ইশারায় নাপিতের দোকান দেখিয়ে দিল। কোনো কথা বলল না।

শেভ করতে করতে তিনি কিছু সিদ্ধান্ত নিলেন।

১. মাথায় চাপ পড়ে এমন কিছু আগামী কিছুক্ষণ করবেন না। রিলাক্সেন জাতীয় ট্যাবলেট খেয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকবেন।

২. বিশ্রামের পর তিনি কোন সামাজিক অবস্থার মানুষ— এটা চিন্তাভাবনা করে বের করবেন।

৩. এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে একটা রিকশা নেবেন। রিকশা হুড ফেলা থাকবে। তিনি হাতের রুমালটা এক হাতে উঁচু করে ধরে রাখবেন। যাতে সবাই তার দিকে তাকায়। চুপচাপ রিকশায় বসে থাকলে কেউ তাকাবে না। একটা হাত উঁচু করে সেই হাতে সাদা রুমাল। মোটামুটি অদ্ভুত দৃশ্য। তখন সবাই তাকাবে। এদের মধ্যে কেউ-না-কেউ বলবে— আরে কালাম! (কিংবা সালাম, কিংবা রহমত কিংবা অন্যকিছু) সমস্যা কী ? কোথায় যান ?

৪. পত্রিকা অফিসে গিয়ে ছবিসহ একটা বিজ্ঞাপন ছাপার কি সময় হয়েছে ? ছবির নিচে কি লেখা থাকবে ? 'কেউ কি জানেন আমি কে ?' এই জাতীয় কিছু।

নাপিত বলল, চুল অনেক বড় হয়েছে। চুল কেটে কলপ দিয়ে দিব ?

কত লাগবে ?

সব মিলায়ে দেড়শ টাকা লাগবে। বিলাতি কলপ।

আমার কাছে আছেই দুইশ' টাকার মতো। এত টাকা খরচ করতে পারব না। ঘণ্টা হিসাবে রিকশা ভাড়া করব, এতেই মেলা টাকা যাবে।

একশ' টাকায় করাইবেন ?

তিনি হতাশ গলায় বললেন, প্রতিটি পয়সা এখন আমাকে হিসাব করে খরচ করতে হবে।

মাথা মালিশ করবেন ? কুড়ি টাকা।

তিনি বললেন, মাথা মালিশ করা যায়। এতে কিছু সুবিধা হবার কথা, তবে ঘাড় মটকাবেন না। এখন বাজে কয়টা ?

একটা বাজে।

আশেপাশে কোনো পার্ক আছে যেখানে শান্তিমতো ঘুমাতে পারি ?

বাড়িতে গিয়া ঘুমান।

বাড়িতে গিয়ে ঘুমানোর সামান্য সমস্যা আছে।

==========================================

বুঝেছি। আর বলতে হবে না। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে চলে যান। ভালো একটা বেঞ্চি দেখে ঘুম দেন।

আপনার নাম কী ?

নিবারণ।

হিন্দু ?

জে হিন্দু।

তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আমি কোন ধর্মের কে জানে ?

নাপিত বলল, কী কইলেন ?

তিনি বললেন, কিছু বলছি না।

নাপিত চুল টানছে। ঘাড়ে থাবা দিয়ে নানান চটকাচটকি করছে। বেশ আরাম লাগছে। আরামে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়েও পড়লেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, তিনি ট্রাফিক কনট্রোল করছেন। তবে তার গায়ে ট্রাফিক পুলিশের পোশাক। মুখে বাঁশিও আছে। ট্রাফিকের বিরাট বিশৃঙ্খলা অবস্থা দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করে তিনি মোটামুটি সামলে ফেলেছেন। শুধু সিগারেটওয়ালা কালামকে সামলানো যাচ্ছে না। সে একটা ট্রাক নিয়ে বের হয়েছে। ট্রাকের একটা চাকা নর্দমায় পড়ে গেছে।

স্যার, বিরাট ঘুম দিয়েছেন। এখন যান।

তিনি নাপিতের চেয়ার থেকে লজ্জিত ভঙ্গিতে নামলেন। নাপিতকে পাওনার ওপরে দশ টাকা বখশিস দিলেন। ঘুমের কারণে শরীরটা ফ্রেস লাগছে। তবে প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। ঢাকা শহরে নিশ্চয়ই তার কোনো একটা বাসা আছে। হয় বড়লোকের বাসা, নয় সাধারণ একটা বাসা। যাই থাকুক, বাসায় পৌঁছতে পারলে সাবান ডলে গরম পানি দিয়ে একটা ভালো গোসল দিয়ে খেতে বসতেন। খাবার পর গল্পের বই চোখের সামনে ধরে আরামের ভাতঘুম।

তিনি নাপিতের দোকান থেকে বের হয়ে একটা ফার্মেসিতে গেলেন। প্রেসার মাপালেন। প্রেসার ঠিক আছে। ওপরেরটা ১৫০ নিচেরটা ৮৫'র কিছু কম। এই বয়সে পঁচাশি প্রেসার তেমন কিছু না। তিনি দু'টা রিলাক্সিন কিনে ফার্মেসিতেই খেয়ে ফেললেন। নার্ভ রিলাক্সড হওয়া দরকার। এতে যদি কিছু মনে পড়ে। তার দরকার লম্বা ঘুম। নাপিতের দোকানের তিন মিনিটের ঘুম না।

তিনি চলে গেলেন সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বিভিন্ন বেঞ্চে অনেকেই আরাম করে ঘুমাচ্ছে। তিনি একটা খালি বেঞ্চ খুঁজে বের করলেন। আর তখনই তেরো-চৌদ্দ বছরের এক ছেলে এসে বলল, খানা খাবেন স্যার ?

কী খানা ?

===========================================

তেহারি, সঙ্গে হাফ ডিম আছে। ত্রিশ টাকা প্লেট।

খাব।

বোতলের পানি দিব না কলের পানি? বোতলের পানি পাঁচ টাকা। তয় কলের পানি কিন্তু ভালো। নিজের হাতে কল চাইপা আনি।

কলের পানিই খাব। নাম কী তোমার?

জেমস।

জেমস মানে কি মণিমুক্তা?

জানি না। আপনি বসেন, আমি খানা নিয়া আসি। অন্যের কাছ থাইক্যা খানা নিবেন না। আমি আপনেরে বুক করেছি।

আমি তোমার কাছ থেকেই খানা নিব। অন্যের কাছ থেকে নিব না।

বালিশ লাগবে স্যার?

বালিশ পাওয়া যায়?

পাওয়া যায়। ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া। দুই টেকা ঘণ্টা।

বালিশ নিব।

জেমস মানে যে মণিমুক্তা এটা মনে পড়ায় তিনি খুবই আনন্দ পাচ্ছেন। ইংরেজি ভাষাটা জানা আছে। তার উচিত একটা ইংরেজি পত্রিকা জোগাড় করে পড়া। পড়লেই বুঝা যেত ভাষার ওপর তার দখল কতটা। জেমস ছেলেটাকে পাঠিয়ে একটা ইংরেজি পত্রিকা কিনাতে হবে।

দুপুরের খাবারটা তিনি খুব আরাম করে খেলেন। তেহারি ছিল গরম এবং সুস্বাদু। তেহারির সঙ্গে সালাদ ছিল। সালাদের কাঁচামরিচ যথেষ্ট ঝাল। ঝাল মরিচের সঙ্গে গরম তেহারির তুলনাই হয় না। খাওয়া শেষ করে তিনি জর্দা দিয়ে পান খেলেন। একটা সিগারেট খেলেন। ভাড়া করা বালিশে মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন।

জেমস বলল, টিপার পুলাপান দিব স্যার? শইল টিপ্যা ঘুম পাড়ায়ে দিবে। পাঁচ টেকা নিবে। ডাকব স্যার?

তিনি বললেন, আচ্ছা ডাক।

তার কাছে এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে তিনি আনন্দে আছেন। স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার পর এই আনন্দ আর নাও থাকতে পারে। হয়তো জানা যাবে তার মাথা খারাপ ছিল। তাকে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হতো। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে তিনি পালিয়ে গেছেন।

কিংবা জানা যাবে তিনি বাস করেন গুলশানে। লেকের পাড় তার বাড়ি। রোজ সন্ধ্যায় তিনি স্ত্রীর সঙ্গে লেকের পানি দেখতে দেখতে চা খান।

=====================================

এক ঘুমে তিনি বাকি দিন পার করলেন। গা টেপা ছেলেটা চলে গেছে। মাথার নিচের বালিশটাও নেই। পকেটের টাকা এবং টাকার সঙ্গে 'রসমালাই' লেখা কাগজের টুকরাটাও নেই। কে লিখেছিল লেখাটা ? তার বড় মেয়ে ?

আঙ্কেল, কিছু লাগব ?

তিনি চমকে তাকালেন। তার সামনেই অল্পবয়সি একটা মেয়ে ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক মেখে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ঠোঁট নিগ্রো মেয়েদের মতো মোটা এবং কালো দেখাচ্ছে। মেয়েটার পরনে লাল শাড়ি। শাড়ির লাল রঙ টের পাওয়া যাচ্ছে। হাতে বেলিফুলের মালা জড়ানো।

লাগব কিছু আঙ্কেল ? আমার বয়স কিন্তু কম। পিপটিন। পনেরো বছর।

আমার কিছু লাগবে না। তোমার নাম কী ?

মেয়েটা বেঞ্চিতে বসতে বসতে বলল, একেক দিন একেক নাম নেই। আইজ আমার নাম কমলা।

তিনি বললেন, কমলা, আমি একটা বিরাট বিপদে পড়েছি। কী বিপদ তোমাকে বলতে পারছি না। কারণ তুমি কিছু করতে পারবে না।

কমলা বলল, চা খাইবেন ?

চা খাব না। আমার পকেটে টাকাপয়সা নেই। সামান্য যা ছিল কে যেন নিয়ে গেছে।

কমলা বলল, চায়ের পয়সা আমি দিব। চা খান।

তুমি চা খাওয়াবে ?

দোষ কী ? খাওয়াইলাম এক কাপ চা।

তিনি ধরা গলায় বললেন, কমলা! তুমি যাই কর না কেন তুমি অতি ভালো একটা মেয়ে। আমার মেয়ের মতোই ভালো।

আপনার একটাই মেয়ে ?

জানি না কমলা।

জানেন না কেন ?

জটিল ঝামেলায় পড়েছি কমলা।

কমলা বিস্মিত গলায় বলল, কানতেছেন কেন ?

তিনি জবাব দিলেন না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

রাত এগারোটা। হালকা বৃষ্টি পড়ছে। দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা। এলিফ্যান্ট রোডের চশমার দোকানগুলির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন। তার প্রচণ্ড ভয় লাগছে।

==========================================



# আলাউদ্দিনের ফাঁসি

ডিসট্রিক্ট দায়রা জজ নূরুল হক সাহেবের বুকে অনেকক্ষণ হলো কফ জমেছে। কফ সরাবার জন্যে হালকাভাবে খুকখুক করেছেন। তাতে লাভ হচ্ছে না। তাঁকে শব্দ করে কাশতে হবে। তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করছেন। আদালতে বিচার চলছে। রাষ্ট্র বনাম আলাউদ্দিন মামলা। আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে শিশু হত্যার অভিযোগ। আলাউদ্দিনকে এই মুহূর্তে পাবলিক প্রসিকিউটর প্রশ্ন করছেন। সবার দৃষ্টি সেই দিকে। এখন তিনি যদি বিকট শব্দে কাশেন সবাই তাঁর দিকে তাকাবে। এটা একটা বিব্রতকর ব্যাপার হবে। নুরুল হক আসামির দিকে তাকালেন। এবং দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। একজন বিচারক হা করে আসামির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন না। বিশেষ করে সেই আসামি যাকে ফাঁসির হুকুম তিনিই দেবেন। তবে এখনো মনস্থির করেন নি। নুরুল হক সওয়াল-জবাবের দিকে মন দিলেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর হামিদ প্রশ্ন করছে। প্রশ্নের মধ্যে নানান নাটকীয়তা। গলার উঠা-নামা। হাত-পা নাড়ানো। নুরুল হকের মনে হলো, হামিদ হিন্দি সিরিয়াল দেখে দেখে এইসব শিখেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর : আপনার নাম ?

আলাউদ্দিন : জনাব, আমি আমার নাম অনেকবার আপনাকে বলেছি। গতকালও বলেছি। এক রাতের মধ্যে তো আমি আকিকা করে নাম বদলাতে পারি না।

পাবলিক প্রসিকিউটর : আপনাকে যা জিজ্ঞেস করা হবে আপনি জবাব দেবেন। আপনার নাম ?

আলাউদ্দিন : নাম ভুলে গেছি। আপনি সুন্দর দেখে একটা নাম দিয়ে দেন। কোর্টের খরচে খাসি জবেহ করে আকিকা করেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর : আপনাকে যা প্রশ্ন করা হবে তার জবাব দিতে হবে। আপনার নাম কী ?

=====================================

আলাউদ্দিন : নাম বলব না।

পাবলিক প্রসিকিউটর : বলতেই হবে।

আলাউদ্দিন : বলেছি তো বলব না। আপনি এক কাজ করেন, আমাকে শাস্তি দেন। নাইলনের দড়ি দিয়ে কোর্টের মধ্যেই নিজের হাতে সিলিং ফ্যানে ঝুলায়ে দেন।

আলাউদ্দিন সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন সে কল্পনায় সিলিং ফ্যানে ঝুলে থাকার দৃশ্য দেখছে। কোর্ট রুমে জোরালো হাসির শব্দ হলো। নুরুল হক এই ফাঁকে কেশে বুকের কফ পরিষ্কার করে নিলেন। এখন তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন। তবে পাবলিক প্রসিকিউটরের ওপর যথেষ্ট বিরক্ত হলেন। নাম কী নাম কী বলে লেবু কচলায়ে বিষ বানায়ে ফেলেছে। সারাদিন চলে যাবে নাম জানতে। আসামির মুখ থেকে নাম যেন জানতেই হবে। আসামিও ত্যাঁদড় আছে। নাম বলবে না। তাঁর নিজেরই একবার ইচ্ছা করছিল বলা— আসামির নাম আলাউদ্দিন। তার বাবার নাম নাসিমুদ্দিন।

জজ হিসাবে তাঁর ভূমিকা রাখা উচিত। হিন্দি সিরিয়ালে দেখা যায়, জজদের হাতে কাঠের হাতুড়ি থাকে। তারা হাতুড়ি দিয়ে হাসির শব্দ বা হৈচৈ থামান। বাস্তবে হাতুড়ি বলে কিছু থাকে না। থাকলে ভালো হতো। টেবিলে বাড়ি দিয়ে বলতে পারতেন, order! order!

নুরুল হক শব্দ করে গলা খাঁকারি দিলেন। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল— বুক পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল এবং হাসির শব্দ থেমে গেল। আসামি এবং পাবলিক প্রসিকিউটর দু'জনই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। আসামিকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। হামিদকে দেখাচ্ছে দাড়িবিহীন ছাগলের মতো।

নুরুল হক বললেন, কোর্টের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চলা বাঞ্ছনীয়। আসামিকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যথাযথভাবে প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে।

হামিদের মুখে হাসি দেখা গেল। এই হাসির নাম আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। তার সবক'টা পান খাওয়া লাল দাঁত দেখা যাচ্ছে। নুরুল হক যথেষ্টই বিরক্ত হলেন। দাঁতের বিষয়ে তাঁর শুচিবায়ু আছে। প্রতিবার খাওয়ার পরে তিনি দাঁত ব্রাস করেন। তাঁর ধারণা একজন মানুষের স্বভাব-চরিত্রের বড় পরিচয় তার দাঁত। আসামির দাঁতগুলি একবার দেখতে পারলে হতো। তবে তিনি তো আর আসামিকে বলতে পারেন না— দেখি, দাঁত দেখি।

পাবলিক প্রসিকিউটর : আপনার নাম ?

আসামি : আলাউদ্দিন।

পাবলিক প্রসিকিউটর : আপনার পিতার নাম ?

==========================================

আসামি : আমার বাবার নাম আমি বলব না। কারণ আমি আসামি, আমার বাবা আসামি না।

পাবলিক প্রসিকিউটর : আপনার বাবার নাম বলুন।

আস্যামি : ডঃ আব্দুল হাই। Ph.D

পাবলিক প্রসিকিউটার : আপনার বাবার নাম নাসিমুদ্দিন। তাহলে কেন বললেন ডঃ আব্দুল হাই Ph.D ?

আসামি : আপনি আমার বাবার নাম জানেন কি-না, তা জানার জন্যে করেছি। এখন দেখা যাচ্ছে আপনি জানেন। খামাকা বিরক্ত করছেন।

কোর্টরুমে আবারো হাসির শব্দ উঠল। এবারের হাসির শব্দ আগের চেয়েও জোরালো। নুরুল হক বিরক্ত মুখে ইশারায় হামিদকে কাছে ডাকলেন। হামিদ গলা নামিয়ে বলল, বদের বাচ্চার অবস্থাটা দেখেছেন স্যার। ঠাট্টা ফাজলামি করছে।

নুরুল হকের নাকে ভক করে জর্দার কড়া গন্ধ লাগল। তিনি বললেন, আপনি কোর্ট রুমে পান জর্দা এইসব খান না-কি ?

না তো স্যার।

আর্গুমেন্টে আসার আগে দেখলাম টিনের কৌটা খুলে পান মুখে দিলেন।

নো, নেভার।

নুরুল হকের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি মিথ্যা সহ্য করতে পারেন না। অথচ তাঁর কাজই এমন যে বাস করতে হয় মিথ্যার মধ্যে। নুরুল হক বললেন, নাম কী তা দিয়ে তো আপনি সারা দুপুর নষ্ট করছেন। মূলে চলে আসুন।

হামিদ বললেন, নাম তো স্যার মূলের মূল।

আপনি এক সপ্তাহ কাটিয়ে দেবেন নাম জানার জন্যে ? আপনি কোর্টের সময় নষ্ট করছেন।

স্যার, আসামিকে খেলায়ে ডাঙায় তুলতে হলে শুরু থেকে ধরতে হয়।

আসামি মাছ না যে তাকে খেলায়ে ডাঙায় তুলতে হবে। আর আপনিও মাছ শিকারি না।

হামিদ চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, স্যার, আমার বিষয়ে কি আপনার অনাস্থা আছে ? আপনি কি মনে করেন যে আমি কম্পিটেন্ট না ?

নুরুল হক বললেন, আমি কিছুই মনে করছি না। ঠিক আছে যান। যা ইচ্ছা করুন।

হামিদ এমনভাবে যাচ্ছে যেন যুদ্ধ জয় করে শিবিরে ফিরে যাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসিও আছে। সবই হিন্দি সিরিয়ালের কোর্ট সিন থেকে শেখা।

==========================================

হিন্দি সিরিয়ালগুলি অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস শেখাচ্ছে। তিনি নিজেও কিছু কিছু শিখছেন। যেমন একটা শায়ের শিখলেন—

"দানে দানে পর লিখ্যা হ্যায়
খানেওয়ালাকা নাম
গুল্লি গুল্লিপর লিখ্যা হ্যায়
মরনেওয়ালোকা নাম।"

এর অর্থ, খাবারের প্রতিটি দানায় লেখা আছে যে খাবার খাবে তার নাম। একইভাবে প্রতিটি গুলিতে লেখা আছে যে মারা যাবে তার নাম।

নুরুল হকের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল চুলকাচ্ছে। বুড়ো আঙুল চুলকানোর রোগটা তাঁর নতুন হয়েছে। চুলকানি শুরু হয় ঘুম ভাঙার পর পর। ঘণ্টাখানিক চলে। আবার দুপুরের দিকে শুরু হয়। ফরাসি একটা প্রবচন আছে—'পঞ্চাশ বছর পার হবার পর ভোরবেলা শারীরিক কোনো যন্ত্রণা ছাড়া যদি ঘুম ভাঙে, তাহলে বুঝতে হবে তুমি মারা গেছ।' তাঁর বয়স তিপ্পান্ন। ভোরবেলা কোনো একটা যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম ভাঙবে এটাই স্বাভাবিক।

কোর্টে নতুন করে আর্গুমেন্ট শুরু হয়েছে। হামিদ ছাগলাটা লাল একজোড়া জুতা নিয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে। বিরাট অভিনেতা। নুরুল হক তার অভিনয়ে নজর দিতে পারছেন না। তিনি চেষ্টা করছেন ফরাসি প্রবচন কোথায় শুনেছেন সেটা মনে করার। আজকাল স্মৃতিশক্তির সমস্যা হচ্ছে। কিছু মনে থাকছে না। সামুদ্রিক মাছের তেল খেলে না-কি স্মৃতিশক্তি বাড়ে। ভিটামিন ওমেগা নামের কী যেন সামুদ্রিক তেলে আছে। প্রবচন নিয়ে চিন্তা না করে অন্যকিছুতে মন দিলে ঝট করে মনে পড়তে পারে। নুরুল হক উকিল কথাবার্তা কী বলছে শোনার চেষ্টা করলেন—

পাবলিক প্রসিকিউটর : এই জুতা জোড়া কি আপনার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল ?

আসামি : পুলিশ বলছে পাওয়া গেছে। যখন পাওয়া গেছে তখন আমি ঘরে ছিলাম না।

পাবলিক প্রসিকিউটর : বলতে চাচ্ছেন পুলিশ মিথ্যা বলছে ?

আসামি : পুলিশ মিথ্যা বলবে এটাই স্বাভাবিক না ? যে বাচ্চাটিকে আমি খুন করেছি বলে বলা হচ্ছে তার জুতা আমি ঘরে কেন সাজিয়ে রাখব ? আপনি বোকা হতে পারেন। আমি তো বোকা না।

'বোকা' শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নুরুল হকের মনে পড়ল এই প্রবচনটা তিনি শুনেছেন এক বোকার কাছে। বোকাটা তার স্ত্রীকে নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে এসে বর্তমানে তাঁর বাড়িতে আছে। বোকাটা তাঁর একমাত্র মেয়ের জামাই। নাম

==================================================

সুজন। ছেলেটা যে এত বোকা আগে বুঝতে পারেন নি। যতই দিন যাচ্ছে তার বোকামি ততই matured হচ্ছে। সে একটা ভিজিটিং কার্ড বানিয়েছে, সেখানে নিজের নাম সুজন লিখেছেন এইভাবে—

shoe john.

ইউরোপ আমেরিকায় জন মানে বাথরুম। তাহলে তার নামের অর্থ দাঁড়াচ্ছে জুতা বাথরুম। আরো খারাপভাবে বললে— জুতা টাট্টিখানা।

বোকাটা 6R সাইজের দু'টা ছবি নিয়ে এসেছে। আগ্রহ করে ছবি দেখিয়েছে। ছবি দেখে কিছুক্ষণের জন্যে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। কারণ একটা ছবিতে প্রেসিডেন্ট বুশ সুজনের গলা জড়িয়ে ধরে আছেন। অন্য ছবিতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি আরবি কায়দায় সুজনের গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে আছেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কী?

সুজন বলল, ফটোশপে করে দিয়েছে। হানড্রেড পারসেন্ট রিয়েল মনে হয়। একশ' ডলার করে নিয়েছে। দু'টা ছবিতে দু'শ' ডলার চলে গেছে। টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়ায় টোটাল একশ' আশি ডলার লেগেছে।

তিনি বললেন, একশ' আশি ডলার খরচ করে এই জিনিস বানানোর মানে কী?

ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখব। লোকজন দেখবে। অবাক হবে।

নুরুল হক কঠিন গলায় বললেন, আমার বাড়িতে এই ছবি টাঙাবে না।

না কেন?

আমি লোকজনকে অবাক করতে পছন্দ করি না। তুমি নিউইয়র্কে একটা মুদির দোকান চালাও। তোমার গালে প্রেসিডেন্ট কেনেডি চুমু খাচ্ছেন ব্যাপারটা কতটা হাস্যকর সেটা কি তুমি জানো? আমার মেয়ে নায়লা কী করে এটা অ্যালাউ করল তা তো বুঝলাম না।

নায়লা ব্যাপারটা খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছে। সে নিজেও একটা ছবি তুলেছে টম হ্যাংসের সাথে।

টম হ্যাংসটা কে?

ফিল্মের হিরো। পলিটিক্যাল কেউ না। সুপার হিরো।

সেই ছবি কোথায়?

সেই ছবি দেখলে আপনি রাগ করতে পারেন এইজন্যে আপনাকে দেখানো হয় নি। তবে রাগ করার কিছু নাই। পুরোটাই তো Fake. আব্বা কি ছবিটা দেখতে চান?

হ্যাঁ চাই।

==========================================

একটা সেকেন্ড, আমি নিয়ে আসছি।

ছবি দেখে নুরুল হক হতভম্ব। ছবিতে বোকা বোকা চেহারার এক যুবক নায়লাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।

হঠাৎ নুরুল হকের অস্থির লাগা শুরু হয়েছে। বুড়ো আঙুলের যন্ত্রণাটাও বাড়ছে। তিনি জটিল আর্গুমেন্ট থামিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আদালত আজকের মতো শেষ।

তিনি এজলাস ছেড়ে খাস কামরার দিকে এগুচ্ছেন, পেছনে পেছনে আসছে হামিদ।

হামিদ বলল, স্যার কি কোনো কারণে আমার ওপর বিরক্ত ?

মিথ্যা কথা বলার জন্যে সামান্য বিরক্ত।

মিথ্যা কথা কখন বললাম ? ও আচ্ছা, পান খাওয়ার বিষয়টা বলছেন ? মনের ভুলে এক খিলি পান মুখে দিয়ে ফেলতেও পারি। সরি ফর দ্যাট। এরকম আর হবে না।

ঠিক আছে।

স্যার, আমার আর্গুমেন্ট কেমন দেখলেন ? ব্যাটাকে তো শুইয়ে ফেলেছিলাম। আজ যদি আরেকটু সময় দিতেন তাকে পুরোপুরি নক আউট করে দিতাম। বদমাইস।

নুরুল হক বললেন, আমার পেছনে পেছনে আসবেন না। প্লিজ।

নুরুল হক আজ অন্যদিনের চেয়ে সকালে বাড়ি ফিরলেন। বসার ঘরে ঢুকেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং মেয়ের জামাইয়ের ছবি বাঁধানো অবস্থায় ঝুলছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ছবিটাও নিশ্চয় আছে। অন্য কোনো ঘরে ঝুলানো হয়েছে।

নুরুল হকের ধারণা ভুল না। দ্বিতীয় ছবিটি তাঁরই শোবার ঘরে। নায়লার মায়ের ছবির পাশে সাজানো। জামাইয়ের স্পর্ধা দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের মতো অপরাধ করেছে বলে তাঁর ধারণা। পেনাল কোডে নতুন নতুন ধারা যুক্ত করার সময় হয়েছে। পৃথিবী বদলাচ্ছে, সময় বদলাচ্ছে, নতুন নতুন অপরাধ তৈরি হচ্ছে।

বাবা, কখন এসেছ ?

নুরুল হক মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়ের মুখ হাসিহাসি। তার গায়ে অ্যাপ্রন, মনে হয় রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। নায়লা বলল, বাবা! আজ আমেরিকান ডিশ

==========================================

খাওয়াবো। বিফ রোস্ট।

নুরুল হক বললেন, ভাত কি রান্না হচ্ছে ?

নায়লা বলল, বিফ রোস্ট ভাত দিয়ে কেউ খায় না বাবা। স্মেসড পটেটো করছি।

নুরুল হক বললেন, এইসব আবর্জনা আমি খাই না। ভাত ডাল করতে বল। ডিম ভাজতে বল।

এত কষ্ট করে রান্না করেছি।

তোরা দুইজন মিলে খা। আরেকটা কথা, তুই কোন অভিনেতাকে নিয়ে যে ছবিটা তুলেছিস সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলবি। আজই ছিঁড়বি।

নায়লা বলল, বাবা ঐটা তো একটা Fake ছবি।

নুরুল হক বললেন, Fake আলামত তুচ্ছ করার বিষয় না। অনেক সময় Fake আলামত, Fake কথাবার্তায় ফাঁসি হয়ে যায়।

একটা ছবি তোলার জন্যে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে ?

গাধা বিয়ে করে তুই গাধি হয়ে যাচ্ছিস। এর বেশি আমি কিছু বলব না। তোর গাধা স্বামীকে জিজ্ঞেস কর সে কোন সাহসে তার মৃত শাশুড়ির ছবির পাশে তার এই ছবি টাঙিয়েছে ?

নায়লা বলল, ঐ জায়গাটায় পেরেক পোতা ছিল বলে আমি নিজে টাঙিয়েছি।

নুরুল হক বললেন, তোর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা হওয়া উচিত। অনাদায়ে আরো দুই বছর কারাদণ্ড। ছবি নামিয়ে এক্ষুনি নর্দমায় ফেল।

দুপুরে আলু ভাজি, ডাল এবং ভাত খেয়ে নুরুল হক ঘুমুতে গেলেন। ঘুম ভালো হবে না তিনি জানেন। ফাঁসি হবার সম্ভাবনা আছে এসব মামলা যখন চলে, তখন তাঁর ঘুম ভালো হয় না। বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখেন। দুঃস্বপ্নে যার ফাঁসি হবার কথা সে সবসময় উপস্থিত থাকে। কদর্য সব অঙ্গভঙ্গি করে। কদাকার চেহারা নিয়ে স্বপ্নে উপস্থিত হয়।

স্বপ্নগুলি বেশিরভাগ দেখেন রাত তিনটার দিকে। তারপর তাঁর আর ঘুম হয় না। তিনি জেগে বসে থাকেন। সূরা ইয়াসিন পাঠ করেন। যদি মন শান্ত হয়। মন শান্ত হয় না। একটা মানুষের জীবন মৃত্যু তাঁর কলমে— ভাবতেই গা শিরশির করে। আলাউদ্দিনের কথাই ধরা যাক। বয়স চল্লিশ। তাকে এত বড় করার জন্যে পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে চল্লিশবার ঘুরতে হয়েছে। কলমের একটা লেখায় সে শেষ, অথচ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতেই থাকবে। কোনো মানে হয় ?

==========================================

ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবের কারণে নুরুল হক গায়ের ওপর চাদর দিয়েছেন। ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ নায়লার কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মফস্বল শহরে ডিসট্রিক্ট জজের বাড়ি বিশাল বাড়ি। মেয়েটা দূরে অন্য কোনো কামরায় কাঁদতে পারে, অথচ কাঁদছে আশেপাশে যাতে তিনি শুনতে পান। গাধি মেয়ে।

নায়লার কান্না শুনতে শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্ন শুরু হলো। স্বপ্নে তিনি বাড়ির পেছনে বকুল গাছের নিচে চেয়ারে বসা। তাঁর সামনের চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে আলাউদ্দিন বসে আছে। আলাউদ্দিনের হাতে পানের কৌটা। সে একটা পান মুখে দিয়ে পিক ফেলল। পিকের রঙ টকটকে লাল। আলাউদ্দিন তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, স্যার কি একটা পান খাবেন ?

আমি পান খাই না।

মহেশখালির পান। মুখে দেয়া মাত্র মাখনের মতো মিলে যাবে। সামান্য একটু জর্দা দিয়ে খেয়ে দেখেন। ময়মনসিংহের মিকচার জর্দা।

আমার স্ত্রী পান খেতেন। আমি খাই না।

আচ্ছা স্যার, মামলার অবস্থাটা কী বলেন। পুলিশের সাক্ষী প্রমাণ তো খুবই দুর্বল। একজন পানওয়ালা জোগাড় করেছে যে বলছে আমি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তার দোকান থেকে ম্যাঙ্গোবার কিনে বাচ্চার হাতে দিয়েছি। পুলিশের জোগাড় করা মিথ্যা সাক্ষী।

নুরুল হক বললেন, মিথ্যা সাক্ষীর ওপরও অনেক সময় ফাঁসি হয়।

আপনার ক্ষেত্রে হবে না। আপনি কঠিন লোক। তবে স্যার পাবলিক প্রসিকিউটর জুতা জোড়া নিয়ে যে যাত্রাপালার পার্ট গাওয়া শুরু করেছে সেটা বন্ধ করা দরকার। এই বিষয়ে কি আপনি একমত ?

হুঁ।

যে কাঁদছে সে আপনার মেয়ে ?

হুঁ।

তাদের সন্তানাদি কী ?

তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। অনেক চেষ্টা করেছে, লাভ হয় নি।

টেস্টটিউবে যেতে বলেন।

এইসব নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছি না।

আলাউদ্দিন আরেকটি পান মুখে দিতে দিতে বলল, ছেলেপুলে না হওয়ার ভালো দিকও আছে।

ভালো দিক কী ?

==========================================

কেউ তাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলতে পারবে না। মুক্তিপণ চাইতে পারবে না। ঠিক বলেছি না স্যার ?

হুঁ।

একটা পান দিই, খেয়ে দেখেন। মৃতা স্ত্রীর কথা মনে করে খাবেন। তার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানো হবে। স্যার, পান দেব ?

দাও।

স্বপ্নের মধ্যে পান চিবুতে চিবুতে তাঁর ঘুম ভাঙল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন। ঘর অন্ধকার, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

নায়লা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাল। নরম গলায় বলল, বাবা চা দেব ?

দে।

চায়ের সঙ্গে এক পিস কেক খাবে ? ফ্রুট কেক। আমি বানিয়েছি।

না, শুধু চা।

নায়লা চা আনতে গেল। তিনি স্ত্রীর ছবির দিকে তাকালেন। ছবির পাশে কেনেডি সাহেবের ছবি নেই। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

নায়লা চা এনে বাবার পাশে বসল। আদুরে গলায় বলল, তুমি হুটহাট করে এমন রাগ কর কেন বাবা ?

নুরুল হক বললেন, বয়স হয়েছে, মনে হয় এইজন্যে।

নায়লা বলল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে নয়মাস থাকব।

নুরুল হক বললেন, থাকতে চাইলে থাকবি। সমস্যা কী ?

তোমার জামাইও থাকবে। সে আমাকে ছাড়া একঘণ্টাও থাকতে পারে না, এইজন্যে থাকবে। আমি বললাম, তোমার গ্রোসারি শপের কী হবে ? সে বলল, গোল্লায় যাক গ্রোসারি শপ। তুমি যেখানে আমি সেখানে।

নুরুল হক কিছু বললেন না, চায়ে চুমুক দিলেন। চা-টা খেতে ভালো হয়েছে। নায়লা বলল, বাবা! নয়মাস কেন তোমার এখানে থাকব বুঝতে পেরেছ ?

বাবার সঙ্গে থাকবি, এর মধ্যে বুঝাবুঝির কী আছে ?

নায়লা বলল, আমার বাচ্চা হবে। এখন দুইমাস। আমেরিকান ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন। বাবা, তুমি আমাদের দু'জনকে গাধা বলো, তোমারও কিন্তু বুদ্ধি কম।

এতদিন বাচ্চা হবার খবরটা বলিস নাই কেন ?

লজ্জা লাগছিল বাবা।

নুরুল হক বললেন, আয় আমার কোলে মাথা রেখে কিছুক্ষণ শুয়ে থাক।

নায়লা বাবার কোমর জড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে কোলে মাথা রেখে শুয়ে ফোঁপাতে লাগল।

নুরুল হক বললেন, তোর জামাই কোথায়?

নায়লা বলল, আশেপাশেই আছে। তোমাকে খুব ভয় পায় তো, এইজন্যে দূরে দূরে থাকে।

কোর্ট শুরু হয়েছে।

আলাউদ্দিন আজ হালকা নীল রঙের হাফশার্ট পরেছে। তাকে সুন্দর লাগছে। নুরুল হক পাবলিক প্রসিকিউটরের হাত থেকে জুতাজোড়া চেয়ে নিলেন। দেড় দু'বছর বয়সি ছেলের রঙিন জুতা। চাপ দিলেই বাজনা বাজে। জুতার একপাশ থেকে আলো বের হয়। সুন্দর সুন্দর জিনিস বের হচ্ছে। এরকম এক জোড়া জুতা তাঁকে তাঁর নাতি বা নাতনির জন্যেও কিনতে হবে। জুতা পায়ে সে ঘুরবে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বাজনা বাজবে। বাচ্চার মা নিশ্চিত থাকবে, বাচ্চা জুতা পায়ে কোথায় যাচ্ছে শব্দ শুনে বুঝে যাবে। নুরুল হক বেশ কয়েকবার জুতা টিপে আওয়াজ করলেন।

শব্দটা শুনতে ভালো লাগছে। একজন জজ সাহেব জটিল খুনের মামলায় জুতা নিয়ে খেলতে পারেন না। তিনি কাঠগড়ার দিকে তাকালেন। কাঠগড়ায় আছে নিজাম। পান-বিড়ি দোকানের মালিক। তাকে ভীত এবং চিন্তিত লাগছে। মনে হয় সে জীবনের প্রথম কাঠগড়ায় উঠেছে। হতাশ চোখে চারদিক দেখছে। তার কপালভর্তি ঘাম। একটু পর পর সে অতি নোংরা রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো। উকিল প্রশ্ন শুরু করলেন। আসামি পক্ষের উকিল। সাত্তার নাম। অতি ধুরন্ধর। হামিদের মতো গর্ধব শ্রেণীর না।

উকিল : আপনার নাম?

নিজাম : জনাব, আমার নাম নিজাম।

উকিল : আপনার একটা পানের দোকান আছে?

নিজাম : জি।

উকিল : আপনি আসামিকে চিনেন?

নিজাম : জি। উনি আমার দোকান থেকে একটা ম্যাঙ্গোবার কিনে বাচ্চাটাকে দিয়েছেন।

উকিল : আপনার দোকানে তো বহু লোক আসা যাওয়া করে। আসামির কথা মনে রেখেছেন কীভাবে? উনি কি প্রায়ই আপনার দোকান থেকে সিগারেট পান

==============================================

বিড়ি এইসব কিনতেন ?

নিজাম : জি স্যার।

উকিল : একটা ছোট্ট সমস্যা হলো, আসামি পানও খায় না, সিগারেটও খায় না। সে কেন রোজ আপনার দোকান থেকে পান সিগারেট কিনবে ?

নিজাম হতাশ চোখে তাকাল। ঢোঁক গিলল।

উকিল : ঐ প্রসঙ্গ থাক। জুতাজোড়ার দিকে তাকান। জুতাজোড়া চেনেন ?

নিজাম : জি স্যার, বাচ্চাটার পায়ে ছিল।

উকিল : একটা বাচ্চা কাঁদছে। তাকে আপনি ম্যাঙ্গোবার দিলেন। আপনার তো বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকার কথা। আপনি জুতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন কেন ?

নিজাম : স্যার জুতার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হয়েছে, এইজন্যে জুতার দিকে তাকিয়েছি।

উকিল : আপনি জবানবন্দিতে বলেছেন আসামি বাচ্চাটা কোলে নিয়ে আপনার দোকানে এসেছে। বাচ্চা কোলে থাকলে তো জুতার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হবে না। ঠিক কি-না বলুন ?

নিজাম : জি স্যার, ঠিক।

উকিল : মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছেন কেন ?

নিজাম : মিথ্যা না স্যার, সত্যি।

উকিল : আপনাকে আমার আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই, আপনি কাঠগড়া থেকে নেমে যেতে পারেন।

কাঠগড়া থেকে নামতে গিয়ে নিজাম হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

উকিল বললেন, মাননীয় আদালতকে একটা বিষয় জানাতে চাচ্ছি। নিজাম নামের এই লোক পুলিশের সোর্সের একজন। পুলিশের মামলায় সে প্রায়ই সাক্ষ্য দেয়। এর আগে তিনবার সে ছিনতাই মামলার সাক্ষ্য দিয়েছে। প্রতিবারই সে ছিনতাই হতে দেখেছে। কিংবা ছিনতাইকারী তার দোকান থেকে বিড়ি সিগারেট কিনেছে।

নুরুল হক কোর্টের কার্যক্রম শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। আজ বৃষ্টি হচ্ছে। ভালো বৃষ্টি। ইচ্ছা করছে একটা রিকশা নিয়ে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরতে। তা সম্ভব না। তাকে গাড়ি নিয়েই ফিরতে হবে।

================================

দুপুরে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে খেতে বসেছেন। বাবুর্চি সালাম রান্না করেছে। সজনে ডাটা দিয়ে পাবদা মাছ। পাবদা মাছের সঙ্গে সজনে যায় না, তারপরেও খেতে ভালো হয়েছে। তাঁর মেজাজ এখন বেশ খারাপ, কারণ মেয়ে জামাই মুরাদ কাঁটা চামচ দিয়ে পাবদা মাছ খাচ্ছে।

মুরাদ বলল, আব্বা, আপনার মামলার কথা সালামের কাছ থেকে শুনেছি। ফাঁসি কি হবে?

নুরুল হক বললেন, এখনো তো মামলা শেষ হয় নাই।

মুরাদ বলল, বছরের পর বছর মামলা না চালিয়ে লটারিতে চলে যাওয়া দরকার। সময় বাঁচে।

নুরুল হক বললেন, লটারি মানে?

মুরাদ বলল, একটা কাগজে লেখা থাকবে দোষী। আরেকটায় লেখা থাকবে নির্দোষী। বিসমিল্লাহ বলে আপনি কাগজ তুলবেন। যেটা উঠবে সেটা। দোষী উঠলে ফাঁসি। নির্দোষী উঠলে খালাস।

নুরুল হক বললেন, আমি খাবার টেবিলে কথাবার্তা পছন্দ করি না। নিঃশব্দে খাও।

মুরাদ বলল, খাওয়ার টেবিলে আলাপ আলোচনা হজমের সহায়ক। আমি রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছি। একটা অসাধারণ পত্রিকা। সব ইনফরমেশন আছে।

নুরুল হক আধখাওয়া অবস্থায় টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। রাতে তার জ্বর উঠল। তিনি জ্বর গায়েই গোসল করে পাকপবিত্র হয়ে ইস্তেখাড়ায় বসলেন। যদি আল্লাহপাক স্বপ্নে কোনো ইশারা দেন। এ ধরনের মামলা চলার সময় তিনি সববারই ইস্তেখাড়া করেন। কোনো লাভ হয় না। ইস্তেখাড়ায় প্রশ্নের উত্তর প্রতীকের মাধ্যমে আসে। প্রতীক থেকে অর্থ উদ্ধার সহজ কর্ম না। বড় বড় আলেম ছাড়া কেউ পারে না।

ইস্তেখাড়ায় স্বপ্নে দেখলেন দু'টা দাড়কাক। একজন আরেকজনকে ঠুকরে মাংস ছিড়ে নিচ্ছে। কাক দু'টি কা কা করছে না। ছোট বাচ্চাদের মতো কাঁদছে। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। বাকি রাত তিনি জেগে কাটালেন।

তদন্তকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। মামলার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিবেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর : আসামি ছেলেটার বাবা-মা'র কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বিশ লক্ষ টাকা চেয়েছিল। ছেলেটার বাবা দশ লক্ষ টাকা জোগাড় করে পাঠান।

==========================================

পুলিশকে এই বিষয়ে তারা কিছুই জানান নি।

আসামি দশ লাখ টাকার ব্রিফকেস রেখে আরো দশ লাখের জন্যে চাপ দেয়। তখন তারা পুলিশকে জানায়। আমরা তখন ফাঁদ পাতি। আসামিকে আরো দশ লাখ টাকা নেবার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে বলি। আসামি আসে। আমরা তাকে গ্রেফতার করি।

আমরা তার মোবাইল সেট জব্দ করি। মোবাইল থেকে যে টেলিফোন করে টাকা চাওয়া হয়েছে তা ফোনের রেকর্ড থেকে নিশ্চিত হই। বাড়ি তল্লাশি করে জুতাজোড়া পাই। এই হলো ঘটনা।

উকিল : এটা যে আসামিরই মোবাইল তার কোনো প্রমাণও নেই। মোবাইল সেটটি নতুন এবং তার সিম কার্ড ফাঁকা।

ইন্সপেক্টর : ফাঁকা বলবেন না। এই সিম কার্ডেই বাচ্চার বাবা-মা'কে টাকা চেয়ে টেলিফোন করা হয়েছে।

উকিল : বাচ্চাটির ডেডবডি আপনারা কোথায় খুঁজে পান ?

ইন্সপেক্টর : আশুলিয়ায়। একটা বস্তার ভেতর ভরে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল।

উকিল : ডেডবডির সন্ধান কী করে পেলেন ? আসামি বলেছে ?

ইন্সপেক্টর : না। ডেডবডি ভেসে উঠেছিল। স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়।

উকিল : বাচ্চাটির মৃতদেহের ছবি কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিষয়ে জানেন ?

ইন্সপেক্টর : জানি।

উকিল : ছবিগুলিতে বাচ্চার দুই পায়েই জুতা ছিল। আমি আদালতে ছবি জমা দিচ্ছি। এখন কথা হলো আসামির ঘরে দু'টা জুতা কীভাবে এল ?

পুলিশ ইন্সপেক্টর থতমত খেয়ে গেলেন।

উকিল : মামনীয় আদালত ! এটা একটা দুর্বলভাবে সাজানো মামলা। বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবার কথা।

নভেম্বর মাস। এর মধ্যে আলাউদ্দিন বেকসুর খালাস পেয়েছে। নুরুল হক সাহেবের এক নাতি হয়েছে। নাতির নাম রূপম। নুরুল হক সাহেব যতক্ষণ বাসায় থাকেন নাতিকে কোলে রাখেন। নায়লা দূর থেকে লক্ষ করেছে— তার বাবা এক মাস বয়েসি নাতির সঙ্গে বিড়বিড় করে মামলা-মোকদ্দমার গল্প করেন।

==========================================

জীবনে সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা কী জানো দাদু ? যখন ফাঁসি হতে যাচ্ছে এমন একজন লোক নির্দোষ প্রমাণিত হয়। খালাস পেয়ে বাড়িতে চলে যায়। আমার জীবনে কয়েকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে। বড় হও। বড় হলে শুনবে। এখন দাদু একটু হাস তো।

এক শুক্রবার সকালে নুরুল হকের সঙ্গে দেখা করতে এল আলাউদ্দিন। হাতে মিষ্টির প্যাকেট। সঙ্গে একটা বড় কাতল মাছ। জীবন্ত। কানকো নড়ছে।

স্যার, আমাকে চিনেছেন ? আমি আলাউদ্দিন।

চিনেছি।

স্যারের নাতি হয়েছে শুনেছি। অতি আনন্দের সংবাদ। নাম কী রেখেছেন ?

রূপম।

বাহ্ নামও মাশাল্লা সুন্দর।

মিষ্টি-মাছ এইসব আমি রাখব না। কিছু মনে করো না।

আপনি রাখবেন না জানি, তারপরেও নিয়ে এসেছিলাম। চিন্তা করবেন না স্যার। ফিরত নিয়ে যাব।

তুমি আজকাল করছ কী ?

আলাউদ্দিন গলা নামিয়ে বলল, রেস্টে আছি। দশ লাখ টাকা লুকানো ছিল, এইটাই খরচ করতেছি।

নুরুল হক হতভম্ব হয়ে তাকালেন।

আলাউদ্দিন বলল, নতুন এক জোড়া জুতা আমিই রেখে দিয়েছিলাম। পুলিশ যখন আলামত হিসাবে জুতা জব্দ করেছে, তখনি বুঝেছি মামলা ডিসমিস। হা হা হা। খুন আমিই করেছি। আপনার মত ঝানু লোক ধোঁকা খেয়েছেন। এইটাই আনন্দের।

==========================================



# ভালোবাসা

সুইটি বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে ঢাকা এসেছে। তার বয়স একুশ। সে 'ইন্টার' পাশ করা মেয়ে। গায়ের রঙ ময়লা হলেও দেখতে সুন্দর। রূপচর্চার দিকে তার বিশেষ ঝোঁক আছে। সপ্তাহে একদিন সে হাতে এবং মুখে কাঁচা হলুদ বাটা মেখে বসে থাকে। মাসে একটা ফেয়ার এন্ড লাভলী ক্রিম তার লাগে।

সুইটির স্বামীর নাম আবুল কাশেম। সে ঢাকায় ব্যবসা করে। কী ব্যবসা সুইটি জানে না। মাসের শুরুতেই মানি অর্ডারে তার নামে সাতশ' টাকা হাতখরচা আসে। এতেই সে খুশি। স্বামীর সংসার করতে আসার সময় সে কিছু উদ্বেগের মধ্যে ছিল। হাতখরচের টাকাটা বন্ধ হয়ে যায় কি-না।

আবুল কাশেম কাওরান বাজারে দুই কামরার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। সুইটি স্বামীর সংসার দেখে ধাক্কার মতো খেল। ঘরে কোনো আসবাব নেই। দু'টা তোশকের ওপর শোবার ব্যবস্থা। কাপড় রাখার আলনা নেই। দড়িতে কাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা। ড্রেসিং টেবিল নেই। বড় আয়না নেই। ক্ষণে ক্ষণে আয়নায় মুখ দেখা সুইটির ছোটবেলার অভ্যাস।

আবুল কাশেম বলল, সংসার শুরু করেছি। আস্তে আস্তে হবে। মুখ ভোঁতা করে থাকবা না।

সুইটি বলল, আয়না ছাড়া মুখ দেখব কীভাবে?

আবুল কাশেম বলল, বাথরুমে আয়না আছে। মুখ দেখতে চাইলে বাথরুমে চলে যাবে।

সুইটি বলল, বাথরুমের আয়নায় তো কিছুই দেখা যায় না।

কিছুই না দেখা গেলে আমি রোজ শেভ করি কীভাবে? এইটা লাগবে সেইটা লাগবে বলে আমাকে অস্থির করবা না। এমনিতেই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বিরাট টেনশনে আছি।

==========================================

সুইটি বলল, রান্নাঘরে কোনো হাঁড়িপাতিলও তো নাই।

আবুল কাশেম বলল, রান্না নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। তিনবেলা খানা চলে আসবে।

আমি কিছু রাঁনব না ?

রান্ধার কিছু জানো ? খামাখা প্যাচাল। একটা জিনিস রাঁনবা, মুখে দিতে পারব না। হবে ঝগড়া। আমি ঝগড়ার পাবলিক না। বিরাট চিন্তায় থাকি। আমার দরকার শান্তি। বুঝেছ ?

আবুল হাশেম বিরাট চিন্তায় থাকে— এটা সুইটির মনে হলো না। যে মানুষ এত চিন্তায় থাকে সে সারাদিন ঘুমাতে পারে না। সকালের নাশতা খেয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুরের আগে তার ঘুম ভাঙে না। ব্যবসার কাজে সে সপ্তাহে এক-দুই দিনের বেশি বের হয় না। কী রকম ব্যবসা কে জানে। একদিন সুইটি জিজ্ঞেস করেছিল। আবুল কাশেম খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বিরক্ত মুখে বলেছে, কিসের ব্যবসা জেনে কী করবা ? ব্যবসার পার্টনার হবা ? তুমি তোমার কাজ করবা, আমি করব আমার কাজ।

সুইটি মিনমিন করে বলল, আমার আবার কী কাজ ?

আবুল কাশেম বলল, কাজের কি অভাব আছে ? মুখে ক্রিম ঘষবা। চুলে তেল দিবা। চুল আঁচড়াইবা। আমি যখন ঘুমায়ে থাকব তখন মাথা টিপ্যা দিবা। স্বামীর সেবা করবা। স্ত্রীর এইটাই সবচেয়ে বড় কাজ। স্বামীর সেবা।

আবুল কাশেমের ব্যবসার পার্টনার হারুন নামের একজন একদিন বাসায় এল। ধূর্ত চেহারা। বেঁটেখাটো মানুষ। নীল রঙের পাঞ্জাবি পরে এসেছে। ক্ষণে ক্ষণে কারণ ছাড়াই পাঞ্জাবি দিয়ে নাক ঘষে। নাকের দু'পাশ এই কারণেই হয়তো লাল হয়ে আছে। লোকটির চোখের দৃষ্টিও ভালো না। সুইটি লক্ষ করল, লোকটা কথা বলছে তার সঙ্গে, কিন্তু তাকিয়ে আছে তার বুকের দিকে। একবারও চোখ নামাচ্ছে না। এবং তার জন্যে কোনো অস্বস্তিও বোধ করছে না।

আবুল কাশেম তার পার্টনারকে খুবই যত্ন করল। মোবাইলে টেলিফোন করে রেস্টুরেন্ট থেকে পরোটা-কাবাব আনাল। মুরগির রোস্ট আনাল। আবুল কাশেমের মুখে সারাক্ষণই— ওস্তাদ, ওস্তাদ। সুইটি ভেবেই পেল না একজন পার্টনার অন্যজনকে ওস্তাদ কেন ডাকবে ?

হারুন চলে যাবার পর সুইটি বলল, লোকটা ভালো না।

কাশেম বলল, ভালো না বুঝলে কীভাবে ?

সুইটি গলা নিচু করে বলল, সারাক্ষণ আমার বুকের দিকে তাকায়ে ছিল।

==========================================

আবুল কাশেম বলল, কদুর মতো বুক বানায়েছ। বুকের দিকেই তো তাকাবে। ঢেকে ঢুকে বসবে না ?

উনারে আমার পছন্দ হয় নাই।

পছন্দ হওয়ার দরকার কী ? তুমি তো তার সাথে হাঙ্গা বসবা না।

সুইটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এইসব কী কথা বলেন ?

আবুল কাশেম মুখের ওপর পত্রিকা ধরতে ধরতে বলল, কান্দনের চেষ্টা করবা না। আমার কাছে চোখের পানির ভাত নাই। তারপরেও যদি কাঁদতে মন চায়— বাথরুমে দরজা বন্ধ কইরা কান্দ। আমার কানে শব্দ না আসলেই আমার দিলখোশ।

বাথরুমে ঢুকে অনেক চেষ্টা করেও সুইটি কাঁদতে পারল না। তবে এই ঘটনার দিন দশেক পর সুইটি খুবই কাঁদল। পত্রিকায় আবুল কাশেমের ওস্তাদ হারুনের ছবি দেখে কাঁদল। হারুনকে পাবলিক পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। সেই ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিতে সে হা করে আছে। চোখ খোলা। অবাক হয়ে কী যেন দেখছে।

হারুনের মৃত্যুশোকে অধীর হয়ে সুইটি কেঁদেছে তা কিন্তু না। সে কেঁদেছে হারুনের মৃত্যু-বিষয়ক খবরের শিরোনাম পড়ার পর।

মলম পার্টির মূল নেতা
হারুন মিয়া জনতার হাতে নিহত।

হারুন মিয়া যদি মলম পার্টির নেতা হয়, তাহলে তার স্বামী কী ? সে তো তাকে ওস্তাদ ওস্তাদ ডাকত।

আবুল কাশেম কয়েকদিন ধরে ঘরেই আছে। ঘর থেকে বের হচ্ছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে চিন্তিত। খবরের কাগজ পড়ে এবং ঘুমিয়ে সময় কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে চা খাচ্ছে। ঘরে এখন চা বানানোর সরঞ্জাম আছে। সুইটি চা বানাচ্ছে। তার চা নাকি ভালো হয়। আবুল কাশেম বলেছে, তোমার চা বানানোর হাত ভালো। জগতের সবচেয়ে জটিল রান্না চা। যে চা রানতে পারে সে কোপ্তা কালিয়া সবই পারে। আমি ঘরে রান্নার ব্যবস্থা করব। অবসর পেলেই তোমাকে নিয়ে নিউমার্কেট কাঁচাবাজারে চলে যাব। রান্নার জন্যে যা যা লাগে কিনে নিয়ে আসবা। খুশি ?

সুইটি বলছে, জি খুশি। আপনার অবসর নাই এইটা বুঝলাম না। দিনরাত তো শুয়েই থাকেন। আপনার কাজটা কী ?

একেকজনের কাজের ধারা একেকরকম। কবি-সাহিত্যিকরা কী করে ? ঘরে বইসা থাকে। তারার কোনো অফিস নাই। আমারও অফিস নাই।

===========================================

সুইটি ক্ষীণগলায় বলল, আপনের ওস্তাদ হারুন মিয়ার খবরটা পত্রিকায় পড়েছি।

আবুল কাশেম বলল, পড়েছ ভালো করেছ। তুমি খুশি তো? এখন আর কেউ তোমার বুকের দিকে তাকায়ে থাকবে না।

সুইটি বলল, কিছু মনে নিয়েন না। আপনেও কি মলমপার্টির লোক?

আবুল কাশেম বলল, আমি মলম পার্টি না ট্যাবলেট পার্টি এটা জানার তোমার প্রয়োজন নাই। আমি স্বামী হিসাবে রোজগার করে তোমার হাতে দিব। তুমি খরচ করবা। সংসার চালাবা।

সুইটি বলল, আমারে দেশে পাঠায়ে দেন।

আবুল কাশেম বলল, স্যুটকেস গোছাও আজই পাঠায়ে দিব। নিজে যেতে পারব না। বাসে তুলে দিব। আগের মতো মাসে মাসে হাতখরচা পাইবা। কোনো অসুবিধা নাই। এখন এককাপ চা বানায়া আন। তোমার হাতের চা ভালো।

সুইটির শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না। বাপের বাড়িতে তার বাবাও নেই মাও নেই। ভাইয়ের সংসারে ফিরে যাওয়া। ভাই গাঁজা খায়। গাঁজার সঙ্গে আরো কী কী যে খায়। সংসারে বিরাট অশান্তি। প্রতি রাতেই তাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। একবার তার ভাই চ্যালাকাঠ দিয়ে ভাবির মাথায় বাড়ি দিল। মাথা ফেটে রক্তারক্তি। হাসপাতালে নিতে হলো। পুলিশ কেইস হতে গিয়েও হয় নি, কারণ সুইটির ভাবি সবাইকে বলেছে— কলঘরে পা পিছলে মাথা ফাটছে। সেই সংসারে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয়?

আবুল কাশেম স্ত্রীকে রান্নাবান্নার সব সরঞ্জাম কিনে দিয়েছে। এমনকি একটা প্রেসার কুকারও কিনেছে। একটা কাজের মেয়ে জোগাড় করেছে, নাম মিনু। মেয়েটার বয়স বারো-তেরো, কিন্তু বড়ই লক্ষ্মী। কাজে-কর্মেও পাকা। বাসা ঝাট দিয়ে মুছে ঝকঝকে করে রাখে।

স্বামীর সঙ্গে সুইটির যথেষ্ট ভাব হয়েছে। আবুল কাশেমের নিয়ে আসা মানিব্যাগ, ব্রিফকেইস, ব্যাগ এইসব প্রথম খুলে দেখতে সুইটির ভালো লাগে। সে বলেই দিয়েছে, আমারে আগে দেখাবেন।

ব্রিফকেস ভেঙে একবার একটা স্বর্ণের চেইন পাওয়া গেল। হাতে নিয়ে মনে হলো এক ভরির চেয়ে কম ওজন না। সুইটি সঙ্গে সঙ্গে তা গলায় পরে ফেলল। আবুল কাশেম কিছুই বলল না। তাকে দেখে মনে হলো সে খুশি।

আরেকবার চামড়ার কালো ব্যাগ খুলে পাওয়া গেল চারটা পাঁচশ' টাকার বান্ডেল। আনন্দে সুইটির যখন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তখন দেখা গেল প্রতিটি

==========================================

বান্ডেলের প্রথম নোটটাই শুধু আসল। বাকি সব নোটের আকারে কাটা কাগজ।

সুইটি বলল, এর মানে কী ?

আবুল কাশেম সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, জগতে কত কিসিমের কত ধান্ধার মানুষ যে আছে তুমি বুঝবা না। চাইরটা আসল নোট পাওয়া গেছে, এতেই আমি খুশি।

সুইটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি সত্যি যদি সবগুলি পাঁচশ' টাকার নোট হইত!

আবুল কাশেম বলল, হবে ধৈর্য ধরতে হবে। আমাদের কাজ ছিপ দিয়ে মাছ ধরার মতো। বেশির ভাগ সময় পুঁটি, খইলসা, টেংরা উঠে। হঠাৎ হঠাৎ বিশাল বোয়াল। আমার ওস্তাদ হারুন মিয়া একবার দশ লাখ টাকা পেয়েছিলেন। তাঁর দলে ছিল চাইরজন। প্রত্যেকে সমান ভাগ পাইছে। দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার। ওস্তাদ নিজের জন্যে এক টাকাও বেশি রাখেন নাই। মানুষ তো এমনে এমনে ওস্তাদ হয় না। ভিতরে জিনিস থাকতে হয়।

আপনে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইছিলেন ?

না। আমি তখন উনার দলে ছিলাম না। পরে যোগ দিয়েছি। বউ শোন, তুমি আমারে আপনে আপনে কর, এইটা ভালো লাগে না। এখন থেকে তুমি না বললে আমি জবাব দিব না। ছবি দেখবা ?

দেখব।

সিনেপ্লেক্স নামে ভালো ছবিঘর বানায়েছে। দেশে উন্নতি হচ্ছে না কথাটা ভুল। যাও সাজগোজ কর।

মিনুরে সাথে নিয়া যাই।

নাও সাথে নাও। মিনু হলো তোমার ডিপার্টমেন্ট। তোমার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তুমি কী করবা সেইটা তোমার ব্যাপার। আমার ডিপার্টমেন্ট আমার।

সুইটি সাজতে বসল। এখন আর বাথরুমের ঝাপসা আয়নায় মুখ দেখতে হয় না। নতুন ড্রেসিং টেবিল কেনা হয়েছে। আয়নাটা ভালো। একটা মানুষ যত সুন্দর আয়নায় তারচেয়ে সুন্দর লাগে। এটা হলো আয়নার গুণ।

শ্রাবণ মাসের কথা। সুইটির সন্তান হবে। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে সন্তান মেয়ে। সুইটি তার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ের নামও ঠিক করে রেখেছে— সুরভী।

সুইটি এখন বেশির ভাগ সময়ই মেয়ের জন্যে কাঁথা বানিয়ে কাটায়। প্রতিটি কাঁথায় নানান ডিজাইন এবং এক কোনায় লেখা— মা সুরভী।

==================================

রাত প্রায় একটা। আবুল কাশেম রাতে বের হলে এগারোটার মধ্যে ফেরে। খুব দেরি হলে বারোটা। আজ এত দেরি হচ্ছে কেন ? সুইটি অস্থির বোধ করছে। মানুষটা মহাবিপদের কাজ করে। একটু উনিশ-বিশ হলে জীবন নিয়ে টানাটানি। পাবলিক হয়ে গেছে পিশাচের মতো। মলম পার্টির একজনকে ধরেছিস, খুব ভালো কথা। পুলিশের কাছে দে। তোরা পিটিয়ে মেরে ফেলার কে ? কোর্ট কাছারি হবে, তারপর সিদ্ধান্ত হবে।

রাত দেড়টায় সুইটি নফল নামাজে বসল। তার হাত-পা কাঁপছে। একটু আগে একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাঁথা সেলাইয়ের একটা সুঁচ আঙুলে ঢুকে রক্তারক্তি হয়েছে। এইসব লক্ষণ খুবই খারাপ। যে মানুষ বারোটার মধ্যে ঘরে ফিরে সে কেন আসছে না ?

সুইটির কাছে একটা মোবাইল টেলিফোন আছে। অনেকবার সে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে। যতবারই সে টেলিফোন করে ওপাশ থেকে একটা মেয়ে মিষ্টিগলায় বলে, 'সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরে আবার চেষ্টা করুন।'

সুইটির ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে থাপড়াতে। আবুল কাশেম তাকে sms করাও শিখিয়েছে। সুইটি দু'টা sms করেছে। একটাতে লিখেছে—

Tumi Ashchona Keno ?

(তুমি আসছ না কেন ?)

আরেকটাতে লিখেছে—

Voi Lagche. Telephone Koro.

(ভয় লাগছে। টেলিফোন কর।)

sms-এর কোনো জবাব আসে নি।

সুইটি দশ রাকাত নফল নামাজ পড়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। তিন রাকাত শেষ হতেই আবুল কাশেম ঘরে ঢুকে বলল, মিনু, গরম পানি দাও, গোসল করব।

সুইটি নামাজ ছেড়ে উঠে পড়ল। পরে পড়লেই হবে। মানুষটাকে ঠিকঠাকমতো গরম পানি দেয়া দরকার। মিনু পারবে না। গোসল শেষ করেই সে ভাত খেতে চাইবে। তরকারি গরম করতে হবে। আজ তার পছন্দের রান্না হয়েছে। কলিজা ভুনা।

ভাত খেতে খেতে আবুল কাশেম বলল, আজ ভালো বিপদে পড়েছিলাম। এক হারামজাদা মহাবিপদে ফেলেছিল। অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছি।

সুইটি আতঙ্কিত গলায় বলল, ঘটনা কী ?

========================================

আবুল কাশেম বলল, হারামজাদাটা ব্যাগ, মোবাইল, মানিব্যাগ ঘড়ি সবই দিয়েছিল। চোখে মলম দিতে যাচ্ছি তখন বলল, ভাই, আপনার পায়ে ধরি, এই কাজটা করবেন না। আমি একটা কলেজের অংকের শিক্ষক, তারপরেও আপনার পায়ে ধরছি।

বলে সে সত্যি সত্যি পায়ে ধরতে এসেছে। আমার মনে মায়া হলো। চোখে মলম না দিয়েই সিএনজি গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিচে ফেললাম। এমনই কপাল, তখন গাড়ির স্টার্ট হয়ে গেল বন্ধ। এইদিকে হারামজাদা কলেজের প্রফেসারটা শুরু করেছে চিৎকার— মলম পার্টি! মলম পার্টি! চারদিক থেকে লোক আসা শুরু করেছে।

সুইটি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, তুমি কী করলা?

আবুল কাশেম বলল, আমি মানিব্যাগ আর মোবাইলটা পকেটে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। হারামজাদা প্রফেসরটাকে ধরলাম। বললাম, ভাই, কী হয়েছে? জায়গাটা অন্ধকার। সে আমি কে বুঝতে পারল না। শুধু বলল, ঐ গাড়িতে মলম পার্টি।

এর মধ্যে লোক জমা হয়ে গেছে। আমার দুই অ্যাসিসটেন্ট আর CNG-র ড্রাইভার গাড়ি ফেলে দিয়েছে দৌড়। তাদের পিছনে পাবলিক।

ধরা পড়েছে?

জানি না। আমি বেশিক্ষণ থাকি নাই। চলে এসেছি।

সুইটি বলল, বিরাট ভুল করেছ। চউখে মলম দেয়া উচিত ছিল।

আবুল কাশেম বলল, অবশ্যই উচিত ছিল।

সুইটি বলল, এরকম ভুল আর করবা না।

আবুল কাশেম বলল, না, এই ভুল আর হবে না। বৌ, কলিজা ভুনা অসাধারণ হয়েছে।

সুইটি স্বামীর পিঠে হাত রাখল। ভালোবাসায় তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে।

==========================================



# টিকটিকি

আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ?

জি-না স্যার।

ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ। আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয় নাই। বুঝতে পারছেন ?

পারছি স্যার।

আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার। উনি যদি একটা Death note রেখে যেতেন, তাহলে কোনো ঝামেলা হতো না। আপনাকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করতাম না।

স্যার, এক গ্লাস পানি খাব।

অবশ্যই। চা দিতে বলব ? চা খাবেন ?

স্যার, আমার চায়ের নেশা নেই।

আপনার স্ত্রী, উনার কি চায়ের নেশা ছিল ?

তেমন না।

তার আত্মহত্যার ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল আরেকবার বলুন। আগেও বলেছেন, আবার শুনি। পানি খান। পানি খেয়ে বলুন।

জহিরের সামনে পানির গ্লাস রাখা হয়েছে। জহির মাত্র দুই চুমুক পানি খেয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল। তার অস্থির লাগছে। যদিও অস্থির লাগার কিছু নেই। যে ওসি সাহেব প্রশ্ন করছেন তার চেহারা অতি ভদ্র। তার গায়ে পুলিশের ইউনিফর্মও নেই। তিনি পান খাচ্ছেন। পান খাওয়া মানুষরা শান্ত প্রকৃতির হয়। জহির ওসি সাহেবের মুখোমুখি বসে নি। কোনাকুনি বসেছে। সে ওসি সাহেবের সামনেই বসতে চাচ্ছিল। ওসি সাহেব বললেন, এই চেয়ারটা ভালো না। গদি ছিঁড়ে গেছে। আপনি এই চেয়ারে বসুন।

==================================

ঘরটা ছোট। দু'টা জানালার একটা বন্ধ। ঘরভর্তি ফাইলপত্র। মেঝেতেও অনেক ফাইল ছড়ানো। মনে হয় এই ঘরটা গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মাথার ওপর সিলিং ফ্যান আছে। সিলিং ফ্যানে ময়লা জমে কুচকুচে কালো হয়ে আছে। ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু তেমন বাতাস পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘরের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে— ঘরভর্তি টিকটিকি। অনেকে টিকটিকি ঘেন্না করে। সে করে না। শায়লা করত। বিয়ের রাতে বাসরঘরে শায়লার শাড়িতে একটা টিকটিকি উঠে পড়েছিল। শায়লা 'ও মাগো!' বলে এমন চিৎকার দিয়েছিল যে চারদিক থেকে লোকজন এসেছে। শায়লার মা দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বলেছেন, কী হয়েছে ? এই শায়লা কী হয়েছে ? লজ্জার ব্যাপার হয়েছিল।

জহির সাহেব শুরু করুন।

কী শুরু করব ?

ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল, অর্থাৎ আপনি কখন জানলেন, আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন ?

আমাদের ফ্ল্যাটে দু'টা শোবার ঘর। সেই রাতে আমাদের সামান্য ঝগড়া হয়েছিল। দু'জন দু'ঘরে শুয়েছি। ভোরবেলা তাকে ডাকতে গিয়ে দেখি, ভেতর থেকে তালাবন্ধ। তখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি সিলিং ফ্যানে শাড়ি পেঁচিয়ে সে ঝুলছে।

আপনি তো একা দরজা ভাঙেন নি। আপনার সঙ্গে লোকজন ছিল।

জি বাড়িওয়ালা ছিল। বাড়িওয়ালার এক শালা নাসিম ছিল।

ওরা কি নিজের থেকেই এসেছিল, না-কি আপনি ওদের ডেকে এনেছেন ?

আমি ডেকে এনেছি। আমার একার পক্ষে দরজা ভাঙা সম্ভব ছিল না। নাসিম খুব শক্তিশালী। নিয়মিত ব্যায়াম করে। সে-ই দরজা ভাঙে।

পুলিশে কখন খবর দিয়েছেন ?

ঠিক সময়টা বলতে পারব না। বাড়িওয়ালা খবর দিয়েছিলেন।

ঝগড়া কী নিয়ে হয়েছিল ?

তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল স্যার। তার এক মামাতো ভাই সুমনের জন্মদিন। তারা থাকে চিটাগাং-এ। শায়লা জন্মদিনে যাবে। আমি যাব না।

আপনি যাবেন না কেন ?

আমি ছুটি পাচ্ছিলাম না। শায়লা বলল, সে একাই যাবে। এই নিয়ে রাগারাগি।

জন্মদিনটা কবে ?

==========================================

আজই সেই ছাতার জন্মদিন।

এক কাপ চা কি খাবেন ? আপনার চায়ের অভ্যাস নেই জানি। তারপরেও এক কাপ হয়তো ভালো লাগবে। সিগারেট খাবেন ?

জি সিগারেট খাব।

সাবধানে ছাই ফেলবেন। চারদিকে কাগজপত্র।

ওসি সাহেব চা দিতে বললেন। সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিলেন। নিজে পানের কৌটা বের করে পান মুখে দিলেন।

আপনার স্ত্রীর মামাতো ভাই সুমন, যার জন্মদিনে যাওয়া নিয়ে এত বড় দুর্ঘটনা, তার বাবার নাম কী ?

ফরিদ উদ্দিন।

উনি কী করেন ?

ব্যবসা করেন। চায়না থেকে ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র এনে বিক্রি করেন।

এত বড় দুর্ঘটনার খবর কি আপনি ফরিদ সাহেবকে জানিয়েছেন ?

জি জানিয়েছি। স্যার, একই ধরনের প্রশ্ন আপনি আমাকে আগেও দু'বার করেছেন।

ভাই, আমাদের পুলিশের এই সমস্যা। একই প্রশ্ন আমরা দু'দিন পর পর করতে থাকি। যদি উত্তরে কোনো বেশকম হয়। যে সত্যি কথা বলবে সে একই উত্তর দেবে। যে মিথ্যা বলবে তার স্মৃতিশক্তি খারাপ হলে একেক দিন একেক জবাব দিবে।

আমি কি এরকম কিছু করছি ?

অবশ্যই না। চা-সিগারেট খান। ইচ্ছা করলে জর্দা দিয়ে একটা পানও খেতে পারেন। মিষ্টি চায়ের পর পান খেতে ভালো লাগে।

জহির চা-সিগারেট শেষ করে একটা পান মুখে দিল।

আপনার স্ত্রী কি পান খেতেন ?

হঠাৎ হঠাৎ। আনন্দের কোনো ঘটনা ঘটলে, বিয়ে বাড়িতে গেলে, কোনো উৎসবে।

আপনাদের ঝগড়াটা শুরু হলো কখন ?

রাত দশটার দিকে। ঘড়ি দেখে তো কেউ ঝগড়া করে না। Exact সময় বলতে পারব না।

ওসি সাহেবের কাছে একটা টেলিফোন এসেছে। তিনি বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একটু বসতে বলুন। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আমার কথা বলা শেষ

==================================================

হবে। টেলিফোন শেষ করে তিনি হাতের ঘড়ি দেখলেন। জহিরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

জহির বলল, স্যার, আপনার ঘরভর্তি টিকটিকি।

ওসি সাহেব বললেন, আপনি টিকটিকি ভয় পান ?

আমি ভয় পাই না। আমার স্ত্রী শায়লা খুব ভয় পেত। বাসররাতে তার শাড়িতে একটা টিকটিকি উঠে পড়েছিল। সে ভয়ে আধমরা হয়ে টান দিয়ে শাড়ি খুলে ফেলে 'ও মাগো' বলে বিকট চিৎকার করেছে। সবাই ভেবেছে না জানি কী। আমি বিরাট লজ্জায় পড়েছিলাম।

লজ্জায় পড়ারই কথা।

শায়লা সবসময় বলত সে এমন একটা দেশে বাস করতে চায় যেখানে টিকটিকি নেই।

এমন দেশ কি আছে ?

শীতের দেশে টিকটিকি থাকে না। আমেরিকা, ইংল্যান্ড। আমার পক্ষে তো তাকে ঐসব দেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

জহির চোখ মুছতে মুছতে বলল, তবে এখন সে যেখানে আছে সেখানে নিশ্চয়ই টিকটিকি নেই। স্যার যদি কিছু মনে না করেন তাহলে টিকটিকি নিয়ে একটা অন্যায় রসিকতা শায়লার সঙ্গে করেছিলাম, সেই গল্পটা বলি ?

বলুন।

আমাদের প্রথম ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে তাকে একভরি সোনার একটা টিকটিকির লকেট বানিয়ে গিফট দিয়েছিলাম। সে খুবই কান্নাকাটি করেছিল। এখন ভেবেই খারাপ লাগছে।

ওসি সাহেব টিসু পেপারের বাক্স এগিয়ে দিলেন। জহির চোখ মুছল। ওসি সাহেব বললেন, প্রশ্ন-উত্তরের ঝামেলাটা শেষ করে ফেলি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বসে আছেন।

জহির চোখে টিসু চাপা দিয়ে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

দু'জন ঘুমুতে গেছেন তখন ঝগড়া শুরু হলো ?

হুঁ।

এক পর্যায়ে আপনি নিজের শোবার ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন ?

জি।

ঘুম হয়েছিল, না-কি নির্ঘুম রাত কেটেছে ?

দু'টা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছি।

==================================================

এক ঘুমে রাত কাবার ?

জি।

জহির সাহেব, আপনার মোবাইল টেলিফোন আমরা চেক করেছি। দেখা গেছে আপনি সারারাতই কাউকে না কাউকে টেলিফোন করেছেন। আর আপনার ঘরেও প্রচুর সিগারেটের টুকরা পাওয়া গেছে। সর্বমোট সতেরোটা। আপনি তো সিগারেট খান না। ঐ দিন মনে হয় এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিলেন।

জহির জবাব দিল না। সে একদৃষ্টিতে ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। ওসি সাহেব বললেন, আপনার স্ত্রীর মামাতো ভাই সুমনকে আপনার স্ত্রী মোবাইল ফোনে একটা এসএমএস পাঠিয়েছেন। সেখানে লেখা আপনারা রাতের বাসে রওনা হচ্ছেন। এই বিষয়ে কিছু জানেন ?

না।

বিভিন্ন বাস কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে যে বাস কোম্পানির টিকিট কেটেছেন সেটা আমরা বের করেছি।

টিকিট কাটলেও অফিস ছুটি দিচ্ছিল না।

আপনার টিকিট বৃহস্পতিবার রাতের। রিটার্ন টিকিট শনিবারের। অফিস শুক্র-শনিবার বন্ধ থাকে।

স্টেশন লিভ করতেও অনুমতি লাগে।

আপনার স্ত্রীর গায়ে ছিল ঝলমলে শাড়ি। মুখে মেকাপ। চোখে কাজল। যেন তিনি বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরি। এই পোশাকে কেউ ঘুমুতে যায় না।

জহির চুপ করে থাকল।

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, খুন আপনি করেছেন। কীভাবে করেছেন সেই বিষয়ে একটা স্টেটমেন্ট দিন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আগেই খবর দিয়ে রেখেছি। উনি আপনার সঙ্গে থাকবেন। স্টেটমেন্ট তৈরিতে সাহায্য করবেন।

ওসি সাহেব ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। জহির চুপচাপ বসে আছে। একটা টিকটিকি টেবিলের ওপর হাঁটাহাঁটি করছে। ঘাড় কাত করে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে জহিরের দিকে।

=======================================



# ভূত

চৌষট্টি বছর বয়সে ইসলামুদ্দিন ঢাকা ছেড়ে তাঁর গ্রামের বাড়ি ধূপখালির দিকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে একটা সুটকেসে কিছু কাপড়চোপড়, টুথপেস্ট-টুথব্রাশ, সাবান। পকেটের মড়ি ঘরে ছয় হাজার তিনশ' টাকা। প্যান্টের পকেটের মানিব্যাগে সাতশ' একুশ টাকা এবং একশ' টাকার দু'টা প্রাইজবন্ড। ইসলামুদ্দিনের দীর্ঘ চাকরি জীবনের এই হলো সম্বল।

ঢাকায় তিনি ভালো চাকরি করতেন। রিটায়ার করেছিলেন ব্যাংকের ক্যাশিয়ার হিসাবে। পেনশন এবং গ্রাচুইটির টাকায় উত্তরায় পাঁচ কাঠা জমি কিনেছিলেন। জমির দখল নিতে পারলেন না। জানা গেল জমির মালিক তিনজনকে একই জমি বিক্রি করেছেন।

তিনি তাঁর অফিসের এক কলিগকে (আবুল কালাম) ব্যবসায় খাটানোর জন্যে ছয় লাখ টাকা দিয়েছিলেন। প্রথম দু'মাস আট হাজার টাকা মুনাফা পেলেন। তৃতীয় মাস থেকে সব বন্ধ। এলসি খোলার কী ঝামেলায় না-কি সব টাকা লোকশান গেছে। নিজের পকেট থেকে টাকা ঢালতে হবে এমন অবস্থা।

ইসলামুদ্দিন ঝিগাতলায় দুই কামরার বাসা ভাড়া করে থাকতেন। নিজেই রান্না করে খেতেন। বুধবার রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, খালি গায়ে ভিক্ষা করছেন। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ির লম্বা লাইন। তিনি প্রতিটি গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, জনাব, দুই দিনের না খাওয়া। একটু দয়া করেন।

স্বপ্ন ভাঙার পরই তিনি ঠিক করলেন, দেশের বাড়ি চলে যাবেন। সেখানে বসতবাড়ি ছাড়া কিছু নেই। দশ বছর আগে একবার এসে দেখেছেন বসতবাড়ির অবস্থা শোচনীয়। কিছু দরজা-জানালা লোকজন চুরি করে নিয়ে গেছে। কিছু ঘুণে খেয়ে নষ্ট করেছে। একতলা পাকা দালান ঝোপ-জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। দেয়ালে বড় বড় ফাটল। সেখানে নিশ্চয় সাপের আড্ডা। একটা রাত নির্ঘুম কাটিয়ে ফিরে এসেছেন।

==========================================

তিনি বসতবাড়ি বিক্রি করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কিনতে রাজি হয় নি। নদী ভাঙতে শুরু করেছে। আশেপাশের অনেক বাড়ি নদী টেনে নিয়েছে। এই বাড়িও নিবে। কার গরজ পড়েছে কেনার!

কার্তিক মাসের এক সন্ধ্যায় তিনি নিজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। আশেপাশের বাড়িঘর সবই নদী টেনে নিয়েছে। তাঁরটাই টিকে আছে। বনজঙ্গলে ঢাকা দালান। মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়বে। ইসলামুদ্দিন ভীত চোখে নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাড়ির পাশেই নদী। নদীর পানি ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করছে। সেই শব্দ ভৌতিক শোনাচ্ছে। ঝোপঝাড়ে নিশ্চয়ই কামিনী ফুলের গাছ আছে। কামিনী ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সেই গন্ধটাও যেন কেমন কেমন।

ইসলামুদ্দিন ঝোলা থেকে মোমবাতি-দেয়াশলাই বের করলেন। ট্রেন থেকে নেমেই তিনি বুদ্ধি করে মোমবাতি-দেয়াশলাই ছাড়াও একটা টর্চ কিনেছেন। খিচুড়ি রাঁধার জন্যে চাল-ডাল তেল-মসলা কিনেছেন। একটা সসপেন কিনেছেন। হারিকেন কেনার ইচ্ছা ছিল। হারিকেন পাওয়া যায় নি। যেভাবে অন্ধকার নামছে তাতে মোমবাতি জ্বালানো অর্থহীন। মোমবাতির আলো অন্ধকার দূর করবে না, বরং আরো বাড়াবে। দীর্ঘপথ হেঁটে আসায় শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। প্রচণ্ড পিপাসা বোধ হচ্ছে। জঙ্গুলে এই বাড়িতে পানি কোথায় পাবেন?

ডাব খান।

ইসলামুদ্দিন চমকে পেছনে তাকালেন। এগারো-বারো বছরের একটা ছেলে কাটা ডাব হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার খালি গা। পরনে লুঙ্গি। চেহারা মেয়েলি। মাথার চুল বড় বড়। চোখও বড় বড়। গায়ের রঙ ফর্সা। এত চমৎকার গায়ের রঙ গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় না। ফর্সা ছেলেপুলেও রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যায়।

তুমি কে?

ছেলেটা জবাব না দিয়ে ডাব বাড়িয়ে দিল। ইসলামুদ্দিন বললেন, তুমি কে? নাম কী?

ছেলেটা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আমি এই বাড়িতে থাকি।

এই বাড়িতে থাকি মানে? তুমি একলা থাক?

হুঁ।

কিছুই তো বুঝলাম না। তুমি বাচ্চা একটা ছেলে, এই ভাঙা বাড়িতে একা থাক, মানে কী?

ডাব খান।

ইসলামুদ্দিন ঘটনায় চমকে গিয়েছিলেন বলেই তৃষ্ণা ভুলে ছিলেন। ডাব

==========================================

দেখে তৃষ্ণা আকাশ স্পর্শ করল। ডাব এক চুমুকে শেষ করলেন। মিষ্টি পানি। ডাবের পানি এত মিষ্টি হয় না। ভেতরে শাঁস হলেই পানি মিষ্টি হয়। ইসলামুদ্দিন বললেন, তোমার বিষয়টা পরে জানব, আগে ডাবটা দুই ফাঁক করে নিয়ে আস। দেখি শাঁস আছে কিনা। বিরাট ক্ষুধা লেগেছে।

ছেলে ডাব নিয়ে অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে গেল। দা দিয়ে ডাব কাটার শব্দ আসছে। ইসলামুদ্দিন স্বস্তি বোধ করছেন। তিনি নির্বান্ধব না। একজন কেউ আছে, যে এখন দা দিয়ে ডাব দু'ফাঁক করছে। একসঙ্গে অনেকগুলি ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। তিনি একা থাকলে ঝিঁঝিপোকার ডাকেই অস্থির হয়ে যেতেন।

ডাব দু'ফাঁক করা বৃথা হয়েছে। কোনো শাঁস নেই। ছেলেটা লজ্জিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ডাবে শাঁস না থাকার অপরাধটা তার।

ইসলামুদ্দিন বললেন, বাবা, নাম কী তোমার ?

ছেলেটা অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল, নাম নাই।

নাম কেন থাকবে না ? নাম বলতে না চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। তুমি কি সত্যি এখানে একা থাক ?

হুঁ।

বাড়ি থেকে রাগ করে পালায়ে আসছ ?

ছেলে জবাব দিল না। পায়ের নখ দিয়ে মেঝের মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। ইসলামুদ্দিন নিঃসন্দেহ হলেন, ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এইজন্যেই নাম বলতে চাচ্ছে না।

কতদিন ধরে এখানে আছ ?

মেলা দিন।

খাওয়া দাওয়া কী করো ?

আমি খাই না।

কী বলে এই পাগলা ছেলে ? না খেয়ে থাকবে কীভাবে ? ইসলামুদ্দিন নিঃসন্দেহ হলেন, ছেলেটা আজই এসেছে। সারাদিন না খেয়ে আছে। ইসলামুদ্দিন বললেন, ঘটনা কী আমাকে খুলে বলো তো। পরীক্ষা খারাপ করেছ ? বাবা বকা দিয়েছে ? পালিয়ে চলে এসেছ ?

আমি লেখাপড়া করি না।

লেখাপড়া করো না এটা তো ভালো কথা না। যাই হোক, এই বিষয়ে পরে কথা বলব। কোনো ভয় নাই, আমি নিজে তোমাকে তোমার বাবার হাতে তুলে দিয়ে আসব। তাকে বলব যেন বকাঝকা না করেন। ঠিক আছে ?

ছেলে অন্যদিকে তাকিয়ে হাসল। ছেলের স্বভাব বিচিত্র। কখনোই মুখের

==============================================

দিকে তাকায় না।

ইসলামুদ্দিন বললেন, বাবা, আগুন জ্বালাতে পারবে? সঙ্গে জিনিসপত্র সবই আছে। খিচুড়ি রেঁধে ফেলব। দু'জনে মিলে আরাম করে খাব। ভালো কথা, পানি আছে?

নদীর পানি।

নদীর পানিতে রান্না চলতে পারে, খাওয়া যাবে না। তুমি কি নদীর পানিই খাও না-কি?

আমি পানি খাই না।

বোকা ছেলে বলে কী? মরুভূমির প্রাণী যে উট, তাকেও পানি খেতে হয়। বিপদের দিনের জন্যে সে তার কুঁজে পানি জমা করে রাখে। আশেপাশে টিউবওয়েল আছে?

ছেলে জবাব দিল না। হুট করে ঘরে ঢুকে বালতি নিয়ে বের হলো। হনহন করে রওনা দিল। ছেলে কাজের আছে। এত বড় বালতি ভর্তি করে পানি আনা তার কর্ম না। গামা পালোয়ানের ছেলে হলেও একটা কথা ছিল।

ইসলামুদ্দিন মোমবাতি হাতে সাবধানে ঘরে ঢুকলেন। খুবই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রতিটি কামরাই পরিষ্কার। দরজা-জানালা নেই, কিন্তু মেঝে ঝকঝক করছে। দেয়ালে মাকড়সার জাল নেই। পাটি পেতে আরাম করে রাত পার করে দেয়া যায়। বোঝা যাচ্ছে ঘর পরিষ্কারের কাজ এই ছেলেই করেছে। এক-দুই দিনে এই কাজ করা সম্ভব না। ছেলেটা মনে হয় কিছুদিন ধরেই এখানে আছে। রাতটা পার হোক— কাল দিনেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। রাজপুত্রের মতো ছেলে বাবা-মা'র ওপর রাগ করে একা পড়ে আছে। কোনো মানে হয়! বাবা-মা নিশ্চয়ই নির্ঘুম রাত পার করছে।

শুকনো লতাপাতা জোগাড় করে ইট বিছিয়ে ইসলামুদ্দিন আগুন ধরিয়ে রান্না চড়িয়েছেন। ছেলেটা বালতি ভর্তি করে পানি নিয়ে এসেছে। বিস্ময়কর ঘটনা। রোগা পটকা ছেলে, দেখে মনেই হয় না গায়ে এত জোর।

ঘি থাকলে ফার্স্টক্লাস একটা খিচুড়ি হতো। ঘি কিনতে হবে। থালা কেনা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কলাপাতা কেটে আনি। কলাপাতায় করে খাব।

ছেলে কলাপাতা কেটে নিয়ে এল।

কাগজি লেবুর চার-পাঁচটা গাছ ছিল। দেখ তো বাবা, লেবু পাওয়া যায় কি-না। লেবু না থাকলে কচি দেখে কয়েকটা লেবু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসো। খিচুড়িতে দিয়ে দেব। মারাত্মক বাস ছড়াবে।

=====================================

ছেলেটা লেবু এবং লেবু পাতা দুইই নিয়ে এল। সে বসেছে একটু দূরে। আগ্রহ নিয়ে রান্না দেখছে। ইসলামুদ্দিন যতবারই তাকাচ্ছেন ততবারই সে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে।

ইসলামুদ্দিন বললেন, পানি যা এনেছ আরাম করে একটা গোসলও দেয়া যাবে। জার্নিতে শরীর নষ্ট হয়ে গেছে। গোসল করলে শরীর ফ্রেস হবে। খেয়েও আরাম পাব। তুমি কি আজ গোসল করেছ?

আমি গোসল করি না।

তোমার কথা কিছুই বুঝলাম না। পানি খাও না, গোসল করো না। বাবা শোন, রান্না হয়ে গেছে। তুমি এখানে এসে বসো। আমি চট করে গায়ে একটু পানি দিয়ে আসি। তারপর আরাম করে খানা খাব।

ইসলামুদ্দিন সময় নিয়ে গোসল করলেন। তাঁর কাছে মনে হলো, দীর্ঘদিন গোসল করে এত আরাম পান নি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসার মতো আরাম।

খেতে এসে তিনি ছেলেটাকে পেলেন না। কোথাও নেই। তিনি 'এই খোকা, এই খোকা' বলে অনেক ডাকাডাকিও করলেন। অদ্ভুত ছেলে তো! কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে। ইসলামুদ্দিনের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তার ধারণা হলো, ছেলেটার মাথায় কিছু দোষ আছে।

খিচুড়ি খেতে খুবই সুস্বাদু হয়েছিল, কিন্তু তিনি খেয়ে একেবারেই আরাম পেলেন না। ছেলেটার জন্যে খারাপ লাগছে। বেচারা না খেয়ে কোথায় ঘুরছে কে জানে!

ইসলামুদ্দিন মেঝেতে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। নদীর বাতাস। কার্তিক মাসের ঠান্ডা হাওয়া। কানের কাছে মশার গুনগুনানি নেই। আহ্, কী শান্তি! ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসছে, তখন দেখলেন তাঁর পাশেই ছেলেটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। কোন ফাঁকে এসে শুয়ে পড়েছে কে জানে! ইসলামুদ্দিন বলতে যাবেন— খিচুড়ি রাখা আছে খেয়ে আস— তার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এক ঘুমে রাত পার। ভোরে উঠে দেখেন ছেলেটি নেই।

সারাদিন ইসলামুদ্দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটালেন। কাঠমিস্ত্রি এনে দরজা ঠিক করানো, চৌকি কেনা, মশারি কেনা, থালাবাসন কেনা। একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা বের হয়ে গেল। উপায় কী? যখন নিঃস্ব হয়ে পড়বেন তখন দেখা যাবে। কপালে যদি ভিক্ষাবৃত্তি লেখা থাকে ভিক্ষাবৃত্তি করবেন। উপায় কী?

সিরাজউদৌলার মতো মানুষকে বলতে হয়েছিল 'উপায় নেই গোলাম হোসেন'। তিনি কোন ছার!

==========================================

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘুমুতে এসে দেখেন, নতুন কেনা চৌকিতে পা ঝুলিয়ে ছেলেটা বসা। তার মুখ হাসিহাসি। সে পা দোলাচ্ছে। নতুন কেনা হারিকেনের আলো পড়েছে ছেলেটার মুখে। সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাবা, তুমি সারাদিন কোথায় ছিলা ?

ছেলে জবাব দিল না। তার পা দোলানো আরো দ্রুত হলো। ইসলামুদ্দিন বললেন, আমার মতো বৃদ্ধ একজন মানুষকে তুমি মহাদুশ্চিন্তায় ফেলেছিলে। কাজটা তো ঠিক করো নাই। রাতের খাওয়া কি হয়েছে ? না হয়ে থাকলে বলো ভাত চড়াব, একটা ডিম ভেজে দিব। যা রেঁধেছিলাম সবই খেয়ে ফেলেছি।

আমি খাই না।

আবার ফাজলামি শুরু করেছ ? মানুষ মাত্রই ক্ষুধার প্রাণী। তাকে খেতে হয়।

আমি মানুষ না।

তুমি মানুষ না, তাহলে তুমি কী ?

আমি ভূত।

তোমাকে থাপ্পড় দেয়ার টাইম হয়ে গেছে। দুই গালে দুই থাপ্পড় দিলে স্ট্রেইট লাইন হয়ে যাবে। স্ট্রেইট লাইন বুঝ ?

না।

স্ট্রেইট লাইন হলো সরলরেখা। যারা বক্র থাকে, তাদেরকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে সরল করতে হয়। তুমি বক্র।

আমি বক্র ?

হ্যাঁ, তুমি মহা বক্র। এখন থেকে তোমাকে ডাকব বক্র।

আচ্ছা।

বক্র মনে হচ্ছে কথাবার্তায় খুবই আমোদ পাচ্ছে। তার মুখভর্তি হাসি। সে সমানে পা দোলাচ্ছে।

বক্রের ব্যাপারটা ইসলামুদ্দিন ঠিক বুঝতে পারলেন না। এবং মনে হয় বোঝার চেষ্টাও করলেন না। আবার এও হতে পারে যে, তিনি আঁচ করতে পারছেন কিন্তু ভাব করছেন না। তিনি বক্রের বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। বক্রের কিছু কিছু জিনিস মেনেও নিলেন।

যেমন—

১. বক্র আসলেই কিছু খায় না।

২. তাকে দিনে কখনোই দেখা যায় না।

৩. সে প্রথম দিন যে লুঙ্গি পরে দেখা দিয়েছিল, এর বাইরে

কিছুই পরে না। ইসলামুদ্দিন তাকে শার্ট-প্যান্ট জুতা কিনে দিয়েছিলেন, সে ছুঁয়েও দেখে নি।

৪. সে গল্প শুনতে খুবই পছন্দ করে, কিন্তু নিজ থেকে কোনো গল্প কখনোই করে না।

রাতে খাবার পর্ব শেষ হবার পর ইসলামুদ্দিনের প্রধান কাজ গল্প বলা। বক্র আদর্শ শ্রোতা। সে ঝিম ধরে গল্প শোনে। সমস্যা একটাই, সে হুঁ হাঁ কিছুই করে না। একজন ঘনঘন হুঁ দিলে গল্প বলে মজা পাওয়া যায়। এই মজাটা ইসলামুদ্দিন পাচ্ছেন না। তাতে অবশ্যি তাঁর সমস্যা হচ্ছে না।

বুঝলে বক্র! আমার জীবন কেটেছে দুঃখে দুঃখে। বিয়ে করেছিলাম, বাসর রাতেই বউ মারা গেল। কীভাবে মারা গেল শুনলে থ মেরে যাবে। সাপের কামড়ে। একেবারে বেহুলা-লখিন্দর গল্প। বেহুলা-লখিন্দরের গল্প জানো?

না।

বাসর রাতে কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করেছিল। আমার বেলায় উল্টোটা হলো, আমার স্ত্রীকে দংশন করল। সে যখন 'উহ্' করে উঠল তখন আমি চমকে দেখলাম, কুচকুচে কালো একটা সাপ খাট থেকে নেমে গেল। এমনভাবে নামল যেন কিছুই হয় নি। সে জানেও না কী সর্বনাশ করে চলে গেল। এরচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা কি শুনবে?

বক্র মাথা নাড়ল। সে শুনবে। ইসলামুদ্দিন সাপের কামড়ের চেয়েও অদ্ভুত এক গল্প শুরু করলেন। গল্প শেষ হতে রাত হয়ে গেল। ইসলামুদ্দিন বললেন, যাও শুয়ে পড়। Early to bed early to rise is the way to be healthy and wise. কী বললাম, অর্থ বুঝেছ?

না।

পড়াশুনা শিখতে হবে। পড়াশুনা ছাড়া চলবে না। বাল্যশিক্ষা, এবিসিডির বই কিনে আনব। প্রতিরাতে এক ঘণ্টা পড়াশোনা, তারপর গল্প।

ইসলামুদ্দিন বইখাতা কিনে নিয়ে এলেন। জোরেশোরে পড়াশোনা শুরু হলো। বক্রেরও আগ্রহের কমতি নেই। অল্পদিনেই সে পড়তে শুরু করল—

জল পড়ে
পাতা নড়ে।
কালো জাম
লাল আম।
বায়ু বয়
ভয় হয়।

================================================

এক রাতে ঘুমুতে যাবার সময় ইসলামুদ্দিন দেখলেন, তাঁর বালিশের কাছে পিতলের একটা লোটা। ইসলামুদ্দিন বললেন, এটা কী রে? (এখন তিনি বক্রকে আদর করে তুই ডাকেন।)

বক্র বলল, আপনার জন্যে এনেছি।

পিতলের লোটা দিয়ে আমি করব কী?

এটা পিতলের না।

পিতলের না তো কিসের?

সোনার। নদীর তলে পড়েছিল। আপনার জন্যে এনেছি।

ইসলামুদ্দিন বললেন, আরে রাখ রাখ, সোনা এত সস্তা না। নদীতে কেউ সোনার লোটা ফেলে রাখে না। মুখে এই কথা বললেও ইসলামুদ্দিন নিশ্চিত বুঝলেন, লোটাটা সোনার। ওজন খুব কম করে হলেও দুই কেজি হবে। সোনার ভরি এখন কত তিনি জানেন না। জানলে দুই কেজি সোনার লোটাটার দাম কত বের করে ফেলতে পারতেন।

বক্র।

হুঁ।

আমার মধ্যে কোনো লোভ নেই, এটা কি জানিস?

হুঁ।

লোটা যেখান থেকে এনেছিস সেখানেই রেখে আসবি।

এখন যাব?

হ্যাঁ, এখন যাবি।

আপনার তো টাকাপয়সা শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরে খাবেন কী?

প্রয়োজনে ভিক্ষা করব। তুই তোর লোটা নিয়ে বিদায় হ।

আরেকবার সে সোনার রাধাকৃষ্ণ মূর্তি নিয়ে উপস্থিত। দশ-বারো কেজি ওজন। এতই সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। কৃষ্ণের চোখে কোনো নীল মণি বসানো। চোখ থেকে নীল আলো বের হচ্ছে।

ইসলামুদ্দিন বললেন, এটা কী জন্যে এনেছিস? আমি কি পূজা করব না-কি?

বক্র বলল, দেখার জন্য এনেছি। সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর। যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে আয়। কোথায় ছিল?

নদীর তলে। পুরনো একটা ভাঙা জাহাজ আছে। তার ভেতরে ছিল। আরো অনেক কিছু আছে। দেখবেন?

না। বক্র শোন, আমাকে লোভ দেখাবি না।

আচ্ছা। আপনাকে খুশি করতে ইচ্ছা করে।

==============================================

আমাকে খুশি করতে ইচ্ছা করলে নিজের সম্পর্কে বল। তুই আসলে কী ? তোর বাবা-মা কে ? এইসব।

বলব না।

আচ্ছা যা বলিস না। বই নিয়ে বোস।

পাঁচ বছর পরের কথা। ইসলামুদ্দিনের শরীর খুবই খারাপ করেছে। একচোখে কিছুই দেখেন না। অন্যচোখে আবছা দেখেন। হাঁপানির সমস্যা হয়েছে। দিনের মধ্যে কয়েকবার হাঁপানির টান ওঠে, তখন তাঁর মরে যেতে ইচ্ছা করে।

দিনে হাঁপানির টান উঠলে বড়ই কষ্ট। দেখার কেউ নেই। রাতে বক্র পাশে থাকে। বুকে রসুন দিয়ে জ্বাল দেয়া সরিষার তেল মালিশ করে দেয়। তালের পাখায় হাওয়া করে। তখন একটু আরাম লাগে।

পৌষ মাসের এক সকালে ঢাকা থেকে তাঁর এক সহকর্মী আবুল কালাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আবুল কালাম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে তিনি ব্যবসার জন্যে ছয় লাখ টাকা দিয়েছিলেন। আবুল কালাম বললেন, একী অবস্থা!

ইসলামুদ্দিন চাদর গায়ে রোদে বসেছিলেন। তিনি ক্ষীণগলায় বললেন, কে ?

আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি আবুল কালাম।

ও আচ্ছা।

আপনার এই অবস্থা তা তো জানি না। জানলে আগেই আসতাম।

ইসলামুদ্দিন বললেন, জনাব, আপনার পরিচয় ?

আবুল কালাম বললেন, কী আশ্চর্য! চিনতে পারছেন না ?

ইসলামুদ্দিন বললেন, চিনেছি। চিনব না কেন ? তবে ঠিক...

আপনার দেখাশোনা কে করে ?

আমার এক পালকপুত্র আছে। সে-ই করে। তার নাম বক্র।

নাম বক্র ? সে কোথায় ?

দিনেরবেলা সে নদীর তলে থাকে। সন্ধ্যাবেলা উঠে আসে। সারারাত থাকে আমার সঙ্গে।

আপনার কথা কিছুই বুঝলাম না। নদীর নিচে থাকে মানে কী ?

আমি নিজেও ঠিক জানি না। সে মানুষ না, অন্যকিছু।

আবুল কালাম বললেন, অন্যকিছুটা কী ?

ভূত হতে পারে।

ভাই, কিছু মনে করবেন না, আপনার তো মনে হয় মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

ইসলামুদ্দিন বললেন, হতে পারে। আমার স্ত্রী যখন সাপের কামড়ে মারা গেল, তখন একবার মাথা খারাপ হয়েছিল। বছরখানিক ছিল। তখন পশুপাখির কথা বুঝতে পারতাম।

এখন পারেন?

না। পারি না।

ভূতের কথা তো মনে হয় বুঝতে পারছেন। ঐ ভূতটা কই?

সন্ধ্যার পর আসবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে দেখতে পারবেন। ভালো ছেলে।

আবুল কালাম বললেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব না। আমি এখনি বিদায় হব। আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন আছে? যাদের খবর দিলে আপনাকে নিয়ে যাবে। দেখাশোনা করবে।

তেমন কেউ নাই। তার প্রয়োজনও নাই। ছেলে আছে। ছেলে আমাকে দেখছে।

ভূতটার কথা বলছেন?

জি।

আপনার অবস্থা দেখে খুবই মনে কষ্ট পেলাম। কিছু টাকা এনেছিলাম। দশ হাজার। টাকাটা রাখেন।

ইসলামুদ্দিন বললেন, ভিক্ষাবৃত্তি এখনো শুরু করি নাই। ছেলে চায়ও না আমি ভিক্ষা করি। সে সন্ধ্যাবেলা নদী থেকে মাছ ধরে আনে। আগুনে পুড়িয়ে লবণ মাখিয়ে দেয়। তাই খেয়ে শুয়ে পড়ি। সে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়।

টাকাটা রাখবেন না?

না।

আমি কি এখন চলে যাব?

আপনার ইচ্ছা।

আবুল কালাম সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে গেলেন। তিনি কিছুই দেখলেন না। তবে লক্ষ করলেন, ইসলামুদ্দিন অদৃশ্য কারো সঙ্গে বিড়বিড় করছেন। হাসছেন।

ইসলামুদ্দিন বললেন, বক্র জিজ্ঞেস করছে আপনি রাতে খাবেন কি-না। রাতে যদি খান তাহলে বড় একটা মাছ ধরে আনবে।

আবুল কালাম উঠে দাঁড়ালেন। একটা উন্মাদ মানুষের সামনে বসে থেকে তার কথা শোনার কোনো মানে হয় না।

আকাশে পৌষ মাসের চাঁদ উঠেছে। ইসলামুদ্দিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাছেই কোথাও বক্র আছে। রাতের খাবারের আয়োজন করছে। ভাবতেই ভালো লাগছে। মাছ পোড়াবার জন্যে আগুন তাঁকে জ্বালাতে হবে। বক্র

আগুন ভয় পায়।

ইসলামুদ্দিন ডাকলেন, বাবা বক্র!

হুঁ।

শুকনা লতাপাতা কিছু আন। আগুন করব। শীত লাগছে।

আচ্ছা।

আগুনে হাত মেলে ইসলামুউদ্দিন বসে আছেন। অনেকটা দূরে বসেছে বক্র। বক্র বলল, গল্প বলুন।

ইসলামুদ্দিন আগ্রহ নিয়ে গল্প শুরু করলেন, আমার স্ত্রী অর্থাৎ তোর মা'র নাম ছিল নীলিমা। নীলিমা নামের অর্থ নীল। নীলের ইংরেজি কী বল তো, দেখি মনে আছে কি-না।

বুলু।

বুলু না। ব্লু। BLUE. বল ব্লু।

ব্লু।

এই তো হয়েছে। আচ্ছা এখন শোন, তোর মাকে নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকলাম। মনটা একটু খারাপ। কারণ তোর মা'র দিকে তাকিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমার মনে হলো স্বামী পছন্দ হয় নাই এইজন্যে সে কাঁদছে। আমি বললাম, নীলিমা, কেঁদো না। বলার সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ করে সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। এক জীবনে কত মানুষকে হাসতে দেখলাম, কিন্তু তোর মা'র মতো সুন্দর করে কাউকে হাসতে দেখলাম না।

ইসলামুদ্দিনের চোখে পানি এসে গেছে। বক্র একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। একসময় সে বলল, বাবা, কাঁদবা না। হাসো। হাসো।

ইসলামুদ্দিন চোখ মুছলেন। হাসলেন।

—



বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, আমার আছে জল...* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।